বাংলা-তরজমা

ছহীহ বুখারী

আবদুল জব্বার সিদ্দিকী

—গওসল্ আজম—

হজরত বড় পীর

'হানাফী' 'আল্-মুসলিম্' 'গুল্-বাগিচা' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক,
'কোর-আনের কথা' 'আরবের তুলাল' 'নবী-কথা'
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

মওলবী আবতুল ওহাব সিদ্দিকী

মখদুমী লাইব্রেরী এণ্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লিঃ
কলিকাতা ও ঢাকা

প্রকাশক—
মখ্‌দুমী লাইব্রেরী এণ্ড আহ্‌ছানউল্লা বুক হাউস, লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—জন্‌সন্ রোড—ঢাকা

প্রথম ছাপা
মে—১৯৪০

দাম দেড় টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী—

মাননীয় মৌলভী এ, কে, ফজলুল্ হক্ সাহেবের

দাস্ত্ মোবারকে—

ভূমিকা

সমুদ্রের একস্থানে ডুব দিলে যেমন ইহার নিতলতা উপলব্ধি করা যায় না, সাহারার ঊষর বুক হইতে একমুষ্টি মরু তুলিয়া লইলে যেমন ইহার দিকহারা বিরাট—বিশালতার কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না, মাহ্‌বুবে সোব্‌হানী, গওসে সামদানী, কুতবে রব্বানী হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর বিরাট জীবনের ইতিহাস—অল্প কথায় বলিতে যাওয়াও তাহাই। দফ্‌তরের পর দফ্‌তর রচনা করিলেও তাঁহার রহস্যময় জীবনের পূর্ণ আলেখ্য অঙ্কন করা দুঃসাধ্য। গোষ্পদের মধ্য দিয়া অনন্ত আকাশের প্রতিবিম্ব দেখিয়া যদি আমরা ধারণা করি—আকাশ কত ক্ষুদ্র, তাহা হইলে ইহা আমাদেরই সংকীর্ণ বুদ্ধির তারিফ ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইবে না।

আমাদের কল্পনা সসীম—দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ, সুতরাং সাধারণ মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া আমরা অসীম অনন্তের বিচার করিতে পারি না, তাই আমাদের চিন্তাশক্তি প্রতিহত হয়, কল্পনা স্তব্ধ হইয়া আসে—পীর দরবেশ ওলী-আল্লাহগণের রহস্যময় জীবনের গতি, পরিণতি এবং তাঁহাদের অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখিয়া। মানব-ধর্ম্মের সাধারণ নীতিকে বিজয়োল্লাসে অতিক্রম করিয়া ইহারা যে রাজ্যে বিচরণ

করেন, যেখানে আমাদের সংকীর্ণ কল্পনা উঁকি মারিতে পারে না, তাই সাধু মহাপুরুষদের জীবন-কথা আমাদের কাছে জটিল রহস্যময় বলিয়া মনে হয়।

আমরা যে মহাপুরুষের অমর-স্মৃতির কূলে দাঁড়াইয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছি, তাঁহার আদর্শ জীবনীর মাঝে লুকাইয়া আছে অনেক কথা—অনেক রহস্য। অনিত্য-সংসারের পরপারে আমাদের চিরস্থায়ী কেয়ামগাহে কি করিয়া বিজয় সাফল্যের সহিত পৌঁছান সম্ভব, মাহ্‌বুবের সহিত হাবিবের মিলন কোন্ পথে, দুনিয়ার মোহমুগ্ধ মানব আমরা, আমাদের পক্ষে তাহার চিন্তা করা দুষ্কর। আমরা দুনিয়ার ভোগ-লালসার মধ্যে— কলুষ-ম্লানিমার মাঝে চির-সুন্দরের আসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, কিন্তু ব্যর্থতা হয় আমাদের সহায়। জীবনের সব ক্ষেত্রে চাই সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের মধ্যদিয়া লাভ করিতে হয়, সাফল্যের হিরণ-মুকুট। আধ্যাত্মিক জীবনের সাফল্য সংগ্রাম ব্যতীত এক তিলও সম্ভব নহে।

মহাপুরুষদের জীবন কথায় এক গতানুগতিক্ প্রবাহ রহিয়াছে। ইহার ভিতর মেকীর ভাগই বেশী। বাঙলা ভাষায় বড় পীর সাহেবের দুই একখানি জীবনী যাহা আমাদের নজরে পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশ 'বানাওট্' কেচ্ছা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ, বাস্তবতার সহিত এইগুলির মোটেই সম্পর্ক নাই। তা ছাড়া বড় পীর সাহেবের কোন কোন জীবনীতে এমন অনেক গুলি কারামত আমরা দেখিতে পাই, ইস্‌লামী আকায়েদ যাহা মোটেই সমর্থন করে না। আমরা নানা বিশ্বস্ত কেতাব

ঘাঁটিয়া অতি সতর্কতার সহিত তাঁহার প্রত্যেক কারামত, জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা নির্ব্বাচন করিয়াছি।

আধুনিক বিজ্ঞান নব নব আবিষ্কারের দ্বারা বিশ্ব-জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। তাসাওফের সহিত বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক, ওলী-আল্লাহগণের নিকট বিজ্ঞানের বাহাদুরী কতখানি পরাস্ত, এই পুস্তকে বিশেষভাবে তাহা দেখান হইয়াছে।

আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, তাই বলিতে ভুলিয়াছি—এই পুস্তক প্রণয়নের কল্পনা—কল্পনাতেই থাকিয়া যাইত, যদি আমি পরম শ্রদ্ধেয় আল্‌হাজ্জ খান বাহাদুর মওঃ আহ্‌ছানউল্লা এম, এ, সাহেবের মধ্যম সাহেবজাদা বন্ধুবর মিঃ মোহাম্মদ নজ্‌মুল্‌ ওলা সাহেবের অনুপ্রেরণা, সহানুভূতি এবং সহায়তা না পাইতাম। বলা বাহুল্য তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বড় পীর সাহেবের জীবনী লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। এসম্বন্ধে আমার সোদর-প্রতিম বন্ধু ডাঃ এ, টী, এম, মোয়াজ্জম সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনাও ভুলিতে পারি না।

আমার দুর্ব্বল লেখনী একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনী রচনায় কতখানি সফল হইয়াছে—জানি না।

দরগাহপুর
পোঃ বাঁকা ভবানীপুর—খুলনা
তাং ১৫ই বৈশাখ—১৩৪৭

বিনীত—
আবদুল ওহাব সিদ্দিকী

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

গওসল্ আজম

হজরত বড় পীর

সূচনা

পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম মানুষ হজরত আদমকে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তায়ালা একদিন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে স্বীয় কুদ্‌রতের হস্ত স্পর্শ করিলেন, অমনি বেহেশ্‌তের সীমাহীন ময়দানে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর দৃশ্য প্রকটিত হইল। হজরত আদম দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাদ্দিকে অসংখ্য আত্মিক দেহ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অবাক্-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া হজরত আদম জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোদা! এ-গুলি কি?" উত্তর হইল—"আদম! এ গুলিকে তুমি চিনিয়া রাখ? ইহা তোমারই ভবিষ্যৎ বংশধরগণের আত্মা। কেয়ামত্ অবধি দুনিয়ায় যত মানুষ জন্ম গ্রহণ করিবে, সূক্ষ্মরাজ্যে আজ তাহাদের আত্মাসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে তুমি দেখিয়াও লও।"

এই সময়ে একটী আত্মা আওলিয়া শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া ঘন ঘন নবীদের শ্রেণীতে মিশিতেছিল, ফেরেশ্‌তাগণ ইহাকে কিছুতেই স্বস্থানে রাখিতে সমর্থ্য হইতেছিলেন না। বার বার ফেরেশ্‌তাদের এই ব্যর্থতা দেখিয়া ঐশী বাণী হইল, মহিউদ্দীন! নবীদের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্যতা তোমার থাকিলেও নবুয়াত শেষ হইবার পরে তোমার জন্ম হইবে। সুতরাং

নবীদলে স্থান লাভ করিতে তুমি পার না, তবে ওলী-শ্রেণীর মধ্যে তুমিই হইবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত ওলীর স্কন্ধদেশে তোমার পদযুগল থাকিবে। তা'ছাড়া খাতেমুন্নাবিঈনের পদ চিহ্ন তুমি স্বীয় পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে।

আল্‌হামদো লিল্লাহ্—কি মধুর সান্ত্বনা বাণী! আত্মাটীর চঞ্চলতা মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল এবং সেজ্‌দায় পড়িয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সহস্র শুক্‌রিয়া আদায় করিল। পাঠক! বুঝিয়াছেন কি, এই পবিত্র আত্মাটী কোন্ ভাগ্যবান্ মহাপুরুষের?

শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) হইতে নবুয়াত্ খতম হইয়া গিয়াছে। অতঃপর ইসলামের সুবিমল মশাল হস্তে যুগে যুগে বহু পীর, গওস্ পৃথিবীতে আর্বিভূত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর মহাপুরুষদের মধ্যে যিনি মুকুট মণি, যাঁহার পবিত্র পদযুগল স্কন্ধে ধারণ করিয়া অন্যান্য ওলিগণ ধন্য হইয়াছেন, যিনি বিশ্ববাসীর অন্তর রাজ্যে অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট, যাঁহার নাম লইলে পাপীর পাপ-তাপ-দগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া যায়, আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত রুহে পাক অর্থাৎ পবিত্র আত্মাটী সেই অমর মহাপুরুষ, গওসল্ আজম, সুলতানুল আওলিয়া, মাহ্‌বুবে রব্বানী হজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলায়হের। তাঁহার অলৌকিক ঘটনা বহুল জীবনের এক ক্ষুদ্রতম ইতিহাস আজ আমরা আমাদের দেশবাসীকে উপহার দিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বংশ পরিচয়

পারস্য দেশে জিলান্ নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশের বাস ছিল। ঐ সম্ভ্রান্ত পরিবারে সৈয়দ আবু সালেহ নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়।

সৈয়দ আবু সালেহ্‌ও একজন শ্রেষ্ঠ তাপস ছিলেন। কথিত আছে, সৈয়দ আবু সালেহ দীর্ঘ দিন ধরিয়া বন-জঙ্গলে, গিরি-পর্ব্বতে খোদার এবাদাতে লিপ্ত থাকিতেন। ধ্যান-স্তিমিত অবস্থায় তাঁহার দিনের পর দিন কাটিত। আহার, নিদ্রা বা বিশ্রামের দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না, কঠোর সাধনায় তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত।

সৈয়দ আবু সালেহ একদিন এক ক্ষুদ্র নদীর তীরে বসিয়া আছেন, ক্ষুধায় তিনি অত্যন্ত কাতর। কয়েক দিন হইতে তিনি অনাহারে রহিয়াছেন, দারুণ ক্লান্তি এবং অবসাদে তাঁহার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, একটী আনার নদীর কূল বাহিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। ক্ষুধায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, সুতরাং ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। তিনি ফলটী তুলিয়া ভক্ষণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ক্ষুধার সামান্য মাত্র নিবৃত্তি হইল।

অতঃপর সৈয়দ আবু সালেহ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যতই তিনি এ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন,

ততই তাঁহার মনের কূলে কে যেন আঘাত করিয়া বলিতে ছিল, "আবু সালেহ! পরের দ্রব্য না বলিয়া ভক্ষণ করা তোমার অন্যায় হইয়াছে। বিবেকের এই তীব্র কষাঘাতে আবু সালেহ অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আর বিশ্রামের অবসর হইল না। তিনি চলিলেন—ফলটীর প্রকৃত মালিকের অনুসন্ধানে। নদীর কূল বাহিয়া তিনি স্রোতের বিপরীত দিকে হাটিতে লাগিলেন। দিন যায়, রাত্রি আসে, আবার রাত্রির অবসান হইলে দিনের আর্বিভাব হয়। রাত্র দিনের এই অবিরাম গতির সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আবু সালেহেরও চলার বিরাম নাই। তিনি জীবনের শেষ পণ করিয়া বাহির হইয়াছেন। সারা জীবন খুঁজিয়াও কি তিনি ঐ ফল বৃক্ষের মালিকের সাক্ষাৎ পাইবেন না? যে কোন উপায় হউক মালিকের ক্ষমা ভিক্ষা লইতেই হইবে।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার পর সৈয়দ আবু সালেহ দেখিলেন, এক স্থানে একটী 'আনার' বৃক্ষ নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বৃক্ষটী ফলে পরিপূর্ণ, তাহা হইতে মাঝে মাঝে সুপক্ক আনার নদীতে পতিত হইতেছে। সৈয়দ আবু সালেহ বুঝিলেন, এই বৃক্ষেরই ফল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং তাহাই তিনি খাইয়াছেন।

সৈয়দ আবু সালেহ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, ফল বৃক্ষটীর মালিক হজরত আবদুল্লাহ সোওমাই নামক একজন প্রাচীন দরবেশ, নিকটস্থ বাড়ীতে তিনি বাস করেন; সৈয়দ

আবু সালেহ দরবেশ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলেন, এবং তাঁহার ক্ষমা চাহিলেন।

জহুরী জহ্‌রত চিনে! হজরত আব্‌দুল্লাহ সোওমাই সৈয়দ আবু সালেহের দিকে একদৃষ্টি চাহিয়াই বুঝিলেন, এই আগন্তুকটী সাধারণ লোক নহেন। আধ্যাত্মিকতার পথে তিনি যে, বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সৈয়দ আবু সালেহের বয়স তখন খুব বেশী নহে। হজরত আব্‌দুল্লার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "দেখ, তোমার এই অন্যায় আচরণের জন্য আমি এই শর্ত্তে ক্ষমা করিতে রাজী আছি যে, তুমি বার বৎসর কাল আমার সহিত বাস করিবে।" সৈয়দ আবু সালেহ দেখিলেন, ক্ষমা প্রাপ্তির পক্ষে এই শর্ত্তে রাজী হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নাই, সুতরাং দরবেশের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া তিনি তাঁহার নিকট রহিয়া গেলেন। উভয় একই পথের পথিক, সুতরাং দরবেশের সান্নিধ্যে সৈয়দ আবু সালেহের দিনগুলি মন্দ কাটিতে ছিল না।

বারটী বৎসর অতীত হইয়া গেলে সৈয়দ আবু সালেহ দরবেশের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দরবেশ—হজরত আবদুল্লাহ সোওমাই একজন প্রবল কাশ্‌ফ্‌শক্তি সম্পন্ন ওলী ছিলেন। তিনি কাশ্‌ফের দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন, যে, এই লোকটীর ঔরসে এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষের জন্ম হইবে।

হজরত আবদুল্লাহ সোওমাই তখন বলিলেন, দেখ বৎস আমার একটী কন্যা রহিয়াছে, সে অন্ধ, বোবা, খঞ্জ এবং অসাড় হস্ত। যদি তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া আরও দুইটী বৎসর এখানে থাকিতে রাজী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি, তা ছাড়া আমার অন্তিম সাধ—কন্যা-পুত্রের মুখ দর্শনও পূর্ণ হইতে পারে।

সৈয়দ আবু সালেহ দরবেশের এই অভিনব প্রস্তাবে প্রথমতঃ একটু চমৎকৃত হইলেও শেষ করিয়া তাঁহাকে এই প্রস্তাবে রাজী হইতেই হইল। কারণ তাহা না হইলে তাঁহার এত চেষ্টা—দীর্ঘ দিনের এত সাধনা যে ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি ক্ষমা লাভ করিবার জন্য যে কোন ত্যাগস্বীকার এবং যে কোন প্রকার কঠোরতা বরণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

শুভ দিনের এক শুভ লগ্নে দরবেশ-দুহিতার সহিত সৈয়দ আবু সালেহের বিবাহ হইয়া গেল। নব-দম্পতির প্রথম মিলন-বাসরে সৈয়দ আবু সালেহ দেখিলেন, এক পরমাসুন্দরী এবং অটুট স্বাস্থ্যবতী কন্যা সেই বাসর-গৃহ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে।

সৈয়দ আবু সালেহ চিন্তা করিতে লাগিলেন এই মেয়েটী কে? তাহার সহিত যাহাকে বিবাহ দেওয়া হইল, তাহার সম্বন্ধে বর্ণিত অবস্থার মিল ত' ইহার মধ্যে কোথাও দেখি না! তবে কি তিনি ভুলবশতঃ অপর কোন গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন? আবু সালেহ স-সঙ্কোচে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

প্রত্যুষে হজরত আবদুল্লাহ সোওমাই কাশফ্ শক্তির দ্বারা রাত্রির ঘটনা জানিতে পারিলেন। তিনি জামাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, বাবা, তোমার ভুল হয় নাই। আমার পূর্ব্ব বর্ণনার সহিত মেয়েটীর অবস্থার মিল যে বর্ণে বর্ণে রহিয়াছে তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি। আমি বলিয়াছিলাম, আমার মেয়েটী অন্ধ, তাহা মিথ্যা নয়। কারণ জীবনে সে কোন 'গায়ের-মোহার্‌ম' পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। বলিয়াছি সে বোবা, তাহা সত্য বটে, কারণ তাহার কর্ণে আজ পর্য্যন্ত কোন অসঙ্গত শব্দ প্রবেশ করে নাই। তুমি শুনিয়াছিলে, সে 'নুলো' বাস্তবিকই তাহাই, কারণ অদ্যাবধি কোন গায়ের মোহার্‌মকে তাহার সে হাত স্পর্শ করে নাই। আরও আমি বলিয়া ছিলাম সে খঞ্জ, যাহার পদ-দ্বয় কোন অন্যায় পথে এক বিন্দু পরিমাণ অগ্রসর হয় নাই, তাহাকে খঞ্জ ছাড়া আর কি বলা যায়?

সৈয়দ আবু সালেহের দ্বিধা ঘুচিয়া গেল। তিনি নব পরিণীতা ভার্য্যার সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই পুণ্যময়ী মহিলা আমাদের বড়পীর সাহেবের জননী উন্মুল খায়ের বিবি ফাতেমা।

বড় পীর সাহেবের জন্ম এবং রমজান মাসের দিবসে স্তন্যপান ত্যাগ

৪৭০ হিজরীর ১লা রমজান বড় পীর হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ কূলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার আদি পুরুষ হজরত আলী করমুল্লাহ অজহু হইতে বড় পীর সাহেব পর্য্যন্ত মাত্র ১২ পুরুষের ব্যবধান ছিল। মাতার বংশানুক্রমিক পরিচয় লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বড় পীর সাহেবের মাতার বংশ হজরত এমাম জয়নুল আবেদিনের বংশের সহিত মিশিয়া যাওয়ায় পিতা ও মাতা উভয় দিক দিয়া একই বংশোদ্ভূত। দুইটি প্রসিদ্ধ হোসেনী ও হোসায়নী বংশের সমন্বয়ে যে অমৃত ফল লাভ হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব।

কঠোর সাধনা এবং প্রাণান্ত রেয়াজাত দ্বারা ওলির আসন লাভ করা যায়। কিন্তু হজরত বড় পীর সাহেব সেই ধরণের ওলি ছিলেন না, তিনি মায়ের পেট হইতেই "মাদের জাত" —অর্থৎ স্বাভাবিক ওলিরূপে ভূমিষ্ঠ হয়েন। তাই জীবনের প্রথম সুপ্রভাত হইতেই তিনি অভূতপূর্ব্ব কারামতের পরিচয় দিতে থাকেন।

বড় পীর সাহেব রমজান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি সারা রমজান মাস দিবসে মায়ের দুগ্ধ অথবা অন্য কিছু পান করিতেন না। মেঘের জন্য যদি রোজা অথবা ঈদের চাঁদ দেখা সম্ভব না হইত, তাহা হইলে এই অবস্থায় বড় পীর সাহেবের মাতাই

ছিলেন এই গোলযোগের চরম সিদ্ধান্ত। তাঁহার কোলের শিশুর স্তন্য পান করা এবং না-করার উপর লোকের রোজা রাখা এবং না-রাখাই নির্ভর করিত।

বড় পীর সাহেব মাতার গর্ভে থাকা কালেও অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। গর্ভসঞ্চয়ের প্রথম মাস হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহু স্বর্গীয় সুসংবাদ তাঁহার মাতা স্বপ্নযোগে পাইতেন। প্রথম মাসে বিবি হাওয়া, দ্বিতীয় মাসে বিবি সারা, তৃতীয় মাসে বিবি আছিয়া, চতুর্থ মাসে বিবি মরিয়ম, পঞ্চম মাসে বিবি খোদেজা, ষষ্ঠমাসে হজরত আয়শা, সপ্তম মাসে হজরত ফাতেমা জোহরা, অষ্টম মাসে জয়নাব বিবি, নবম মাসে হজরত হোসেনের বিবি স্বপ্নযোগে বড় পীর সাহেবের আগমন সম্পর্কে মাতা ফাতেমা বিবিকে বলিতেন, "ওহে ফাতেমা, সৈয়দ বংশের সৌভাগ্য-রবিকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ৭ তুমি ধন্য, তোমার গর্ভে গওসল্ আজম।" কথিত আছে, বড় পীর সাহেব যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, ঐদিন জিলান শহরে কোন রমণী কন্যা সন্তান প্রসব করে নাই। ঐদিন প্রায় এগার শত গর্ভবতী রমণীর প্রত্যেকেই পুত্র সন্তান প্রসবের সৌভাগ্য অর্জ্জন করে। সূতিকা গৃহে যে সমস্ত স্ত্রীলোক বিবি ফাতেমার সেবা কার্য্যে উপস্থিত ছিল, তাহাদের বর্ণনায় প্রকাশ, ভূমিষ্ঠ হইবার পর বড় পীর সাহেবের গোলাপ পাপ্ড়ীর মত ঠোঁট দুইখানি মৃদু কম্পিত হইতেছিল, এবং তাহা হইতে "আল্লাহ" "আল্লাহ"

রব বাহির হইতেছিল। দোলনার কচি শিশুর যে সব স্বাভাবিক অভ্যাস থাকিতে পারে, বড় পীর সাহেবের তাহা ছিল না। কোন নামাজের সময় তিনি ঘুমাইতেন না। তাঁহার বিছানা-পত্র সর্ব্বদা পাক্ পরিষ্কার থাকিত।

বড় পীর সাহেবের বাল্যকাল এবং গ্রাম্য মক্তবে বিদ্যা শিক্ষা

খেলা ধূলা, আমোদ প্রমোদ শিশুদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বড় পীর সাহেব কোন দিন বৃথা আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতেন না। সর্ব্বদা তিনি দুষ্ট ছেলেদের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতেন। বড় পীর সাহেবের আশ্চর্য্য কেরামত ছিল যে, কোন ছেলে তাঁহার সংসর্গে আসিলে সে মোমের মত গলিয়া যাইত। বালক সুলভ চপলতা সে মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইত। কথিত আছে, বড় পীর সাহেবের শিশুকালের এগার শত সাথী ওলি-আল্লাহর স্থান লাভ করিয়া ছিলেন। বড় পীর সাহেবের পবিত্র সংসর্গের গুণে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। বড় পীর সাহেব ভুলিয়া যখনই কোন অন্যায়ের পথে পা বাড়াইয়াছেন, অমনি দৈববাণী শুনিয়া চমকিত হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে মাতার ক্রোড়ে পাঁচটী বৎসর কাটিয়া গেল। অতঃপর এলেম শিক্ষার জন্য তিনি গ্রাম্য মক্তবে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু বড় পীর সাহেব যখন বিস্‌মিল্লাহ হইতে আরম্ভ

করিয়া কোর-আন মজিদের ১৯ পারা পর্য্যন্ত ক্রমন্বয়ে পড়িয়া ফেলিলেন, তখন সকলের বিস্ময়ে সীমা রহিল না। যে বালক পূর্ব্বে কোনদিন স্কুল-মক্তবে পা দেয় নাই, যাহাকে সবে মাত্র হাতে খড়ির জন্য মক্তবে আনা হইয়াছে, তাঁহার মুখে ১৯ পারা কোর-আন হেফ্‌জ শ্রবণ করা কম আশ্চর্য্যের কথা নহে।

অবাক্‌-বিস্ময়ে অভিভূত শিক্ষক বড় পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমি পূর্ব্বে কাহারও নিকট পড়িয়াছিলে?" উত্তর হইল—"না"।

—"তবে এই কোর-আন শিখিলে কাহার নিকটে?"

—"মায়ের নিকট।"

—"তোমার মায়ের নিকট কি তুমি পড়িতে?"

—"না।"

—"তবে?"

—"আমার মা ১৯ পারার হাফেজ, প্রত্যেক রাত্রি ঈশার নামাজের পর জননী উহা তেলাওয়াত করিতেন, প্রায় দশমাস কাল মায়ের পেটে থাকিয়া প্রত্যহ উহা শ্রবণ করার ফলে আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে।"

বড় পীর সাহেবের স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি সামান্য কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় এত খানি পড়া আয়ত্ত করিতে পারিতেন, যাহা অপরাপর ছেলেদের পক্ষে এক মাস সময়ের প্রয়োজন হইত।

বড় পীর সাহেব মক্তবে উপস্থিত হইলে একজন অপরিচিত লোক অন্যান্য ছেলেদের লক্ষ্য করিয়া কহিতেন "তোমরা এই আল্লাহর অলীকে সম্মান কর, ইহাকে ভাল আসনে বসিতে দাও।"

আট বৎসর বয়স কালে বড় পীর সাহেব এক দিন রাত্রিতে ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময় একজন স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে কহিতেছেন, "মহিউদ্দীন ! মনে রাখিও, নিদ্রার আরাম উপভোগের জন্য খোদা তোমাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন নাই।" বড় পীর সাহেব নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার আর শোওয়া হইল না ! তিনি অজু করিয়া নামাজে খাড়া হইলেন। কথিত আছে, ইহার পর হইতে বড় পীর সাহেব এশার নামাজ পড়িয়া সেই অজুতে ফজরের নামাজ পড়িতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার এই নিয়মের কোন দিন ব্যতিক্রম হয় নাই।

শিক্ষার জন্য বড় সাহেবের বাগদাদ গমন

মক্তবের পড়া শেষ করিয়া বড় পীর সাহেব ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতৃভূমি জিলানে অবস্থান করেন। এই সময় তাঁহাকে পশু চারণ, জমি কর্ষণ, ইত্যাদি সংসারের নানা কঠোর পরিশ্রমের কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত।

একবার এক বকরাঈদের পূর্ব্বদিন বড় পীর সাহেব মাঠে চাষ করিবার জন্য একটী বলদকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিলেন, গরুটী কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চাহে না, বড় পীর সাহেবও

তাহাকে সজোর হাঁকাইতেছিলেন, সহসা গরুটী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আবদুল কাদের! খোদা তায়ালা তোমাকে এই কাজের জন্য প্রেরণ করেন নাই, তোমার কার্য্য অন্যরূপ।" নির্ব্বাক চতুষ্পদ জন্তর মুখে এই সতর্কবাণী শুনিয়া বড় পীর সাহেবের হৃদয় এক অজ্ঞাত ভাব তরঙ্গে দুলিয়া উঠিল। তাঁহার আর চাষ করা হইল না। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এত সকাল সকাল বাড়ী ফিরিলে কেন?" বড় পীর সাহেব জননীর নিকট সকল কথা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "মা, আমি বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বাগদাদে যাইব, আপনি আমাকে হাসিমুখে বিদায় দান করুন।"

মাতা কহিলেন—"বাবা, ইহা ত আনন্দের কথা, তোমরা দুই ভাই আমার নয়নের রোশ্‌নাই, কলিজার টুক্‌রা, তোমাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্য চোঁখের আড়াল করিলে আমি বাঁচি না। কিন্তু তবুও আমি আজ তোমার বাগদাদ গমনের কথা শুনিয়া অধীর আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছি। তুমি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মানুষ হইবে, ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আমার আর হইতে পারে না। খোদা তোমার রক্ষক, স্বদেশে-বিদেশে সর্ব্বস্থানে তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন। তাঁহার উপর মতি রাখিয়া চলিলে তোমার উপর কোনই বিপদ আসিবে না।

শুভ-দিনে বড় পীর সাহেব বাগদাদ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন, পারস্য দেশ হইতে বাগদাদ বহু দূর। কত মরুভূমি,

পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, তা ছাড়া সে সময়ে যান-বাহনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পথ অতিরিক্ত দুর্গম থাকায় পথচারীদিগকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত। সেই পথে দস্যু-ডাকাতের উৎপাত এত অধিক ছিল যে, বৃহৎ কাফেলা বন্দী হইয়া পথ চলিলেও অনেক সময় দস্যুদের হস্তে ধনপ্রাণ নিরাপদ থাকিত না।

এক বৃহৎ কাফেলা বানিজ্য ব্যাপদেশে বাগদাদাভিমুখে যাইতে ছিল, বড় পীর সাহেব তাহার সহিত যাত্রা করিলেন।

যাত্রার প্রাক্কালে মাতা কহিলেন—বাবা, আমি অতি কষ্টে ৮০ টী "দীনার" সঞ্চিত করিয়া ছিলাম, তাহার মধ্যে ৪০ টী তোমার ভ্রাতা আহ্মদের জন্য রাখিয়া দিয়াছি, অবশিষ্ট ৪০টী তোমারই প্রাপ্য, ইহাই তোমার পাথেয়। পাছে চোর ডাকাতে হরণ করিয়া না লইতে পারে, তাই তোমার জামার বোগলের নিম্নে এগুলি সেলাই করিয়া দিতেছি। বাছা! একটী কথা তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি, যে কোন অবস্থায় হউক, কখনও মিথ্যা কথা বলিও না। সর্ব্বদা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে।

অতঃপর স্নেহময়ী মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বড় পীর সাহেব কাফেলাদের সহিত বাগ্দাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

———

দস্যুদলের আক্রমণ এবং তওবা করিয়া অন্যায় পথ পরিত্যাগ

দিনের পর দিন চলিতে চলিতে কাফেলা 'হাম্‌দান্' নামক এক দিগন্ত বিস্তীর্ণ মরুভূমির মাঝে আসিয়া উপনীত হইল। সমস্ত দিন চলিবার পর রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য উক্ত কাফেলা এক স্থানে আসিয়া তাবু স্থাপন করিল।

গভীর রাত্রি। কাফেলার লোকজনের মধ্যে কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ মাল পত্র পাহ্‌রা দিতেছে। এমন সময় হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া একদল সশস্ত্র ডাকাত কাফেলার উপর আসিয়া আপতিত হইল। দস্যুদলের মার্ মার্ শব্দে নিঝুম—নিস্তব্ধ মরুভূমি কাঁপাইয়া তুলিল। কাফেলাগণের জিনিষপত্র, পণ্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া দস্যুগণ ফিরিতেছিল, এমন সময় একজন দস্যু বড় পীর সাহেবকে একটু রসিকতাচ্ছলে কহিল, বালক! আমরা সকলেরই মালপত্র টাকা কড়ি লুণ্ঠন করিয়াছি, তোমাকে ত' এতক্ষণ দেখি নাই। তোমার নিকট কি আছে? বড় পীর সাহেব অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন, আমার নিকট ৪০ টী দীনার রহিয়াছে। একথা দস্যুর বিশ্বাস হইল না, সুতরাং সে চলিয়া গেল। সে মনে করিল, ঠাট্টা স্থলে আমি যেমন প্রশ্ন করিয়াছি, উত্তরটাও ঠিক তেমনিই হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে আর এক জন দস্যু বড় পীর সাহেবকে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। সুতরাং ঠাট্টা মনে করিয়া সেও স্বকাজে প্রস্থান করিল। কারণ

একটী ছিন্নবাস পরিহিত বালকের কাছে ৪০ দীনার থাকিতে পারে, একথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহা ছাড়া পৃথিবীতে এমন কে নির্ব্বোধ রহিয়াছে, যে, দস্যুদের নিকট অকপটচিত্তে তাহার গুপ্ত সম্পদের কথা ব্যক্ত করিবে ?

অতঃপর লুন্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া দস্যুগণ তাহদের সর্দ্দারের নিকট উপস্থিত হইল। কথা প্রসঙ্গে একজন দস্যু কহিল, "কাফেলার ভিতর একটী অদ্ভুত বালককে দেখিয়াছিলাম, আমি তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নিকট কি আছে, সে বলিল ৪০ টী দীনার আছে, ঠাট্টা মনে করিয়া আমরা তাহার দীনারের খোঁজ আর লই নাই।" তাহার কথা আরও কয়েকজন দস্যু সমর্থন করিল, এবং তাহারাও যে বালকটীর কাছে একই উত্তর পাইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিল।

ইহাদের এই কথায় সর্দ্দারের কৌতূহল জন্মিল। সে বালকটীকে ধরিয়া আনিতে আদেশ করিল। তাঁবুর এক কোণের বাহিরে বসিয়া বড় পীর সাহেব খোদার এবাদাতে লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় কয়েকজন দস্যু তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং সর্দ্দারের নিকট উপস্থিত করিল।

সর্দ্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বালক! তোমার নিকট কি রহিয়াছে ?" বড় পীর সাহেব বিনা দ্বিধায় উত্তর করিলেন, "৪০ টী দীনার রহিয়াছে।" সর্দ্দার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা কোথায় ?" বড় পীর সাহেব কহিলেন, "আমার জামার ভিতর বোগলের নিম্নে সেলাই করা রহিয়াছে।"

বড় পীর সাহেবের কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য সর্দ্দার একজন দস্যুকে জামা ফাড়িয়া দেখিতে আদেশ করিল। নির্দ্দিষ্ট স্থান ফাড়িবা মাত্র তথা হইতে চল্লিশটী দীনার বাহির হইয়া পড়িল। সর্দ্দার এবং তাহার অনুচরগণ অবাক্। তাহারা অপলক নেত্রে একবার বড় পীর সাহেবের দিকে এবং একবার তাঁহার সযত্ন রক্ষিত মুদ্রাগুলির দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে সর্দ্দার বড় পীর সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বালক, তুমি এত যত্ন করিয়া মুদ্রাগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছ কেন?

পীর সাহেব—দস্যু তস্করের ভয়ে।

সর্দ্দার—আমরা দস্যু, পরের জিনিষ বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া থাকি, তাহা কি তুমি জান?

পীর সাহেব—জানি এবং তাহা চোখেও দেখিলাম।

সর্দ্দার—তবুও তুমি নিজের সযত্ন রক্ষিত ধন আমাদের কাছে প্রকাশ করিলে কেন?

পীর সাহেব—আমি গৃহ হইতে যাত্রা করিবার কালে আমার জননীই মুদ্রাগুলি ঐ স্থানে সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বিদায় দিবার সময় উপদেশ স্বরূপ বলিয়াছিলেন, "বাছা! কোন অবস্থায় কখনও মিথ্যাকথা বলিও না।" তাই তোমাদের লোক জিজ্ঞাসা করা মাত্রই আমি আমার একমাত্র সম্বল ঐ মুদ্রার কথা বলিয়া দিয়াছি। কারণ মাতার উপদেশ আমি অমান্য করিতে পারি না।

মায়ামন্ত্রের প্রভাবে মানুষ নিশ্চল প্রস্তরে পরিণত হয়,

বড় পীর সাহেবের কথায় দস্যুদলের সেরূপ অবস্থা হইল। তাহাদের হাতের অস্ত্র মাটীতে খসিয়া পড়িল।

সর্দ্দার ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হায়! যুগের পর যুগ ধরিয়া আমরা খোদার না-ফরমানী করিতেছি। হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, পরস্ব-হরণ প্রভৃতি কুকার্য্যগুলি আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র বালক মাতার একটি মাত্র আদেশ পালনের জন্য নিজের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়াও সত্য-রক্ষা করিয়াছে, আর আমরা প্রত্যহ বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ তায়ালার শত শত আদেশ অমান্য করিতেছি। আমরা নরাধম, দোজখেও কি আমাদের স্থান হইবে? খোদার নিকট আমরা কি করিয়া মুখ দেখাইব? বন্ধুগণ! আর না, এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। এই বালক সাধারণ মানুষ নহে। খোদা আমাদের দুষ্কার্য্যে বিরক্ত হইয়া আমাদের হেদায়তের জন্য ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

সর্দ্দারের ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদে অন্যান্য দস্যুগণের পাষাণ-হৃদয় গলিয়া গেল। তাহারা বড় পীর সাহেবের হস্তে তওবা করিয়া কুপথ পরিত্যাগ করিল। কাফেলাদের যে সমস্ত ধন সম্পদ তাহারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল, তাহা সবই ফিরাইয়া দিল।

সত্য কথার কি অপূর্ব্ব মহিমা!

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাগদাদে শিক্ষা লাভ

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাগদাদ শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল। অতি দূর দূরান্তর হইতে সহস্র সহস্র শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার জন্য এখানে সমবেত হইত। সাধারণ ধর্ম্ম শিক্ষা ব্যতীত ইউনানী, ডাক্তারী, বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যা এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। মোট কথা সমগ্র পৃথিবীর বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল এই পুণ্যভূমি বাগদাদ্। এখানে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন।

হজরত গওসল্ আজম্ শেখ আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলায়হে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদে উপনীত হইলেন।

কোর-আনের তফ্সির, হাদিস, ফেকাহ, উসুল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য বড় পীর সাহেব বড় বড় শিক্ষাবিদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ ও জগদ্বরেণ্য আলেম কাজী আবু সাইদ্ মোবারক বিন্ আলী মোকার্রামী, আবু ওফা আলী বিন্ আকীল, আবু গালেব্ আহমদ, আবুল কাসেম আলী, আবু জাকারিয়া ইয়াহ্য়া

তাব্রেজী, নেজামিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল প্রভৃতির নিকট তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

বড় পীর সাহেবের ধীশক্তি অতি অসাধারণ ছিল, তিনি এক ঘণ্টার অধ্যয়নে যে বিষয় জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন, অন্যান্য ছাত্রদের পক্ষে সপ্তাহব্যাপী পরিশ্রমে তাহা সম্ভব হইত না। তিনি অল্পকাল মধ্যে সর্ব্ববিষয় গভীর পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেন।

মহিউদ্দীন আখ্যা লাভ

একদিন পীরাণে পীর, গওসল্ আজম হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী নগ্নপদে বাগদাদাভিমুখে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে তিঁনি দেখিতে পাইলেন, একজন অতি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ একস্থানে বসিয়া আছে। সে বড় পীর সাহেবকে দেখিয়া কহিল, "হে গওসল আজম! আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। দীর্ঘ রোগ ভোগে আমার দেহে মাত্র কয়খানি হাড্ডি অবশিষ্ট রহিয়াছে। তুমি দয়া করিয়া একবার আমাকে হাত ধরিয়া তোল। আমি নিজ শক্তিতে উঠিতে পারিতেছি না।" বড় পীর সাহেব পরম যত্নে হাত বাড়াইয়া তাহাকে তুলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বড় পীর সাহেবের পবিত্র হস্ত তাহার দেহে স্পর্শ করিবা মাত্র যেন ভোজবাজীর

মত সেখানে এক পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কোথায় সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ! তদ্স্থানে দাঁড়াইয়া আছে স্বর্গের মাধুরী লইয়া এক পরম স্বাস্থ্যবান্ যুবক। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার যেন কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া পীর সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেই জ্যোতিষ্মান মূর্ত্তি মধুরস্বরে কহিল, হে মাহ্বুবে রব্বানী! আপনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না? আমি ইস্লাম—বিশ্বধর্ম্ম ইস্লাম। আমি দুর্ব্বল—শক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আপনার স্পর্শে আমার নবজীবন ফিরিয়া আসিয়াছে। আপনি "মহিউদ্দীন" বা ইসলামের প্রাণদাতা নামে খ্যাতি লাভ করিবেন। ইস্লাম আপনার সংস্পর্শে তাজা শক্তি—নববল লাভ করিবে।

কথিত আছে, আল্লাহর ফেরেশতা বড় পীর সাহেবকে এই গৌরবময় "মহিউদ্দীন" আখ্যা প্রদানের জন্য ইসলামের রূপান্তরিত অবস্থায় দেখা দিয়া ছিলেন। অতঃপর বড় পীর সাহেব জুমআ মস্জিদে গমন করেন। নামাজের পর জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া এক জোড়া নূতন পাদুকা প্রদান করিয়া সকলের সমক্ষে তাঁহাকে "মহিউদ্দীন" বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে উপস্থিত সকল লোক আসিয়া তাঁহার হস্তে চুম্বন প্রদান করে।

দয়ার সাগর হজরত বড় পীর

বড় পীর সাহেব যে সময় বাগ্‌দাদে উপনীত হন, তখন তাঁহার নিকট মাত্র ৪০টী "দীনার" অর্থাৎ প্রায় ২০০৲ শত টাকা ছিল, তিনি নিতান্ত সরল এবং নিরাড়ম্বর জীবন-যাপন করিতেন। সুতরাং এত গুলি মুদ্রা তাঁহার নিকট প্রচুরই ছিল। তিনি দিবসে মাত্র একবার আহার করিতেন। লেবাস-পোষাকের দিক দিয়া তাঁহার আদৌ ব্যয়-বাহুল্য ছিল না। এইসব দিকে লক্ষ্য করিলে ৪০ টী দীনার তাঁহার বহুদিন চলিবার কথা। কিন্তু অবস্থা ইহার বিপরীত ঘটিল। কারণ দুঃখীজনের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। তিনি নিজের সর্ব্ববিধ অভাব-অনাটনের কথা ভুলিয়া গিয়া পরের দুঃখ মোচনের জন্য মুক্তহস্তে নিজের যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেন। এইভাবে ব্যয় করিতে করিতে তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং নানাবিধ কঠোর-সংগ্রামের মধ্যে তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত।

বড় পীর সাহেব নিজের চরম দুরবস্থার বিষয় কাহাকেও জানিতে দিতেন না। কাহারো নিকট কিছু প্রার্থনা করা তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। সবক্ লইয়া তিনি প্রত্যহ বাগদাদ শহরের বাহিরে যাইতেন এবং নির্জ্জন গিরি-কাননে কিংবা তাইগ্রীস-কূলে বসিয়া তাহা অভ্যাস করিতেন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রায়ই গাছের পাতা খাইয়া দিনের পর দিন কাটাইতে হইয়াছে।

একদিন অভাবের তাড়নায় বড় পীর সাহেব দারুণ উদ্বেগের সহিত কাল কাটাইতে ছিলেন, কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার কোন আহারই জোটে নাই। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন এক অদৃশ্য পুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন, "আব্দুল কাদের! তুমি কাহারও নিকট হইতে কিছু ধার গ্রহণ করিয়া পড়ার দিকে মনোযোগ দাও।" বড় পীর সাহেব কহিলেন—"আমি নিতান্ত কাঙাল, সুতরাং এই পথের ভিখারীকে কে ধার দিবে? তা ছাড়া ধার পাইলেও তাহা পরিশোধ করিবার শক্তি-সামর্থ্য আমার কোথায়?" তখন সেই অদৃশ্য পুরুষ আরও কহিলেন, "তুমি নির্ভাবনায় ধার গ্রহণ করিতে পার। কারণ তাহা পরিশোধ করিবার দায়িত্ব আমারই।"

———

বড় পীর সাহেবের প্রতি গায়েবী মদদ্

এই কথা শুনিয়া বড় পীর সাহেব এক রুটী-বিক্রেতার নিকট যাইয়া কহিলেন ঃ তুমি আমাকে প্রত্যহ দেড় খণ্ড করিয়া রুটী এই শর্ত্তে দিতে পার কি, যে, যখন আমি টাকা কড়ি সংগ্রহ করিতে পারিব, তখনই তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। এই কথা শুনিয়া রুটী-বিক্রেতার চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে টলমল করিয়া উঠিল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আপনি যত দিন ইচ্ছা এখান হইতে রুটী লইয়া যাইবেন, মূল্য প্রদানে কোন বাধ্য বাধকতা নাই।

বড় পীর সাহেব প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দেড় খানি করিয়া রুটী তথা হইতে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রুটীর সহিত খাইবার অন্য কিছুই ছিল না। সুতরাং সেই নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক রুটী খাইয়াই তাঁহাকে জীবন ধারণ করিতে হইত। এই ভাবে দীর্ঘদিন চলিল, এদিকে দোকানের দেনাও বাড়িতে লাগিল। রুটী-বিক্রেতা আপত্তি না করিলেও আর অধিক দিন ধারে রুটী গ্রহণ করিতে তাঁহার দারুণ সঙ্কোচ বিবেচিত হইতে ছিল। এই অবস্থায় আবার সেই অদৃশ্য পুরুষ কহিলেন, "বৎস! অমুক পরিত্যক্ত দোকানে যাইয়া যাহা পাইবে, তাহাই গ্রহণ কর।" বড় পীর সাহেব সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া একটী সোনার মোহর প্রাপ্ত হইলেন। ইহার দ্বারা তাঁহার যাবতীয় দেনা পরিশোধ হইল।

এক সময় বাগ্দাদে ভীষণ অন্ন কষ্ট দেখা দেয়। দুর্গত নগরবাসীর করুণ হাহাকারে চারিদিক ভরিয়া উঠে। এমন কি লোকে দারুণ জঠর জ্বালায় নানা অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকে। এই সময় বড় পীর সাহেব প্রত্যহ তাইগ্রীস নদীকূলে যাইয়া খাদ্যান্বেষণ করিতেন, কিন্তু সেখানে ঘাস ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যাইত না; অবশেষে অন্যান্য লোক তথায় হানা দিতে শুরু করিলে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। পীর সাহেব কোন দিন অন্যকে বঞ্চিত করিয়া আহার গ্রহণ করিতেন না। একদিন নদীকূলে আহার অন্বেষণে ব্যর্থ হইয়া তিনি বাগ্দাদের মস্জিদে ফিরিয়া আসিলেন, ক্ষুধায়

তাঁহার শরীর অবসন্ন, হস্ত পদ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি মস্‌জিদের এক কোণে বসিয়া রুটী ভক্ষণ করিতেছে। সে ব্যক্তি বড় পীর সাহেবকে তাহার সহিত রুটী ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু বড় পীর সাহেব ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। লোকটী খোদার নামে তাহার সহিত আহার করিতে বলিলে বড় পীর সাহেব এবার আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। আহারের সময় লোকটী কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিল, যিনি তাহার সহিত আহার করিতেছেন, তিনিই শেখ আবদুল কাদের জিলানী। ইহাতে লোকটী বড় পীর সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দেখুন, আমি জিলান হইতে আসিয়াছি, আপনার মাতা আপনাকে দিবার জন্য ৮টী দীনার দিয়াছেন। আজ দীর্ঘদিন ধরিয়া বাগদাদের অলিতে গলিতে আপনার খোঁজ করিয়া ফিরিতেছি, আপনার ঠিকানা আমার জানা ছিল না। সুতরাং আপনার সহিত আজ এইরূপ আকস্মিক সাক্ষাতে পরম সুখী হইলাম। এই নিন্ আপনার টাকা, আমার নিজস্ব অর্থ নিঃশেষিত হইয়া গেলেও আপনার অর্থে এযাবত আমি হস্তক্ষেপ করি নাই। গত দুই দিন সম্পূর্ণ উপবাসে কাটাইয়া অদ্য তৃতীয় দিনে আপনার অর্থ হইতে সামান্য কিছু ব্যয় করিয়া জীবন রক্ষার উপযোগী কিঞ্চিৎ খাদ্য ক্রয় করিয়াছি।

বড় পীর সাহেব তাহার নিকট হইতে অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাকে পাথেয় স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় দিলেন।

বড় পীর সাহেবের আদর্শ দান-খায়রাত্

বাগদাদে অবস্থান কালে একবার বড় পীর সাহেব প্রায় কুড়ি দিন যাবত অনাহারে কাল কাটাইতে ছিলেন, অবশেষে তিনি মৃত্যু প্রায় অবস্থায় "আইওয়ানে কাস্‌রা" নামক একটী নির্জ্জন ভগ্নস্থানে খাদ্য অন্বেষণের জন্য উপস্থিত হইলেন, তথায় যাইয়া দেখিতে পাইলেন, আরও ৭০ জন আওলিয়া তথায় খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় রত রহিয়াছেন। ইহাদের সহিত খাদ্যান্বেষণে প্রতিযোগিতা করা সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া বড় পার সাহেব তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বাসায় ফিরিয়া পীর সাহেবের সহিত তাঁহার দেশের একটী লোকের সাক্ষাৎ হইল। তিনি বড় পার সাহেবকে কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দিয়া কহিলেন ঃ ইহা আপনার মাতা প্রেরণ করিয়াছেন। বড় পীর সাহেব তখনই ঐ মুদ্রা লইয়া সেই বিরানা স্থানে ছুটিলেন, এবং একটী মাত্র নিজের জন্য রাখিয়া বাকি গুলি সেই ওলীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।

বাগদাদ শরীফে শিক্ষা লাভ কালে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়া বড় পীর সাহেবের দিন কাটিয়াছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহাকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাটাইতে হইয়াছে, তবুও তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষার পথে আদৌ বিঘ্ন ঘটে নাই। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে অতি অল্প দিনের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং ব্যুৎপত্তি

অর্জ্জন করেন। মহিউদ্দীন মোহাম্মাদ নাজ্জার তাঁহার বিশ্ব-বিশ্রুত ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত গওসল আজম ঐযুগের শ্রেষ্ঠ কৃতবিদ্য পুরুষ, তাঁহাকে ফেকাহ ও হাদিস শাস্ত্রের "ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া" বা বিশ্বকোষ বলা চলে।

একবার বড় পীর সাহেব বাগদাদে লোকদিগকে কোর-আন শিক্ষা দিতে ছিলেন। তথায় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান এবং শক্তিশালী লেখক শেখ জামালুদ্দিন এবনে জওযি উপস্থিত ছিলেন, বড় পীর সাহেব একটি আয়াত পড়িয়া ইহার বিভিন্ন অর্থ এবং ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কোন্ বিদ্বান এ সম্বন্ধে কি অর্থ লিখিয়াছেন তিনি তাহাও দেখাইলেন, যখন তিনি একটি উদারণ পেশ করিতেছিলেন, তখন এব্‌নে জওযির জনৈক সহচর কানে কানে তাঁহাকে বলিতেছিলেন, আপনি ইহা জানেন কি না, বার দফা দৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত এবনে জওযি হাঁ উত্তর দিলেন, কিন্তু তাহার পর চল্লিশ দফা পর্য্যন্ত একই আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও নির্ঘণ্ট শুনিয়া এবনো জওযির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ওলীদের উপর এবনো জওযির যে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধ-মূল ছিল, সে দিন হইতে তাহা দূর হইল।

———

এক ব্যক্তির অভিবন প্রশ্নের উত্তর প্রদান

একবার এক আজমী ব্যক্তি (যে আরব-বাসী নহে) শপথ করিল যে, সে যদি কিছুকাল এমন কোন নূতন পদ্ধতিতে খোদার এবাদত না করিতে পারে, যাহা কোন সময় কেহ করে নাই, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে। লোকটি কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার স্ত্রী তালাক হইবে না, এই প্রশ্ন এরাকের তৎকালীন নামজাদা আলেম্ এবং ফকিহের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহ সন্তোষ-জনক উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে লোকটী বড় পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাহার এই অভিনব প্রতিজ্ঞার কথা জানাইল। বড় পীর সাহেব তৎক্ষণাৎ বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া এমন উপায় বলিয়া দিলেন যে, যাহার দ্বারা লোকটীর প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হইল অথচ স্ত্রীও তালাক হইল না। সমস্ত লোক পীর সাহেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইল।

অচিরে পীর সাহেবের বিদ্যাবত্তা এবং গভীর জ্ঞান গবেষণার সুযশঃ সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার নিকট কোর-আনের সূক্ষ্মতত্ব এবং ফেকাহ্-হাদিসের জটিল মীমাংসা শুনিবার জন্য দলে দলে লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

———

তৃতীয় অধ্যায়

কঠোর সাধনা

"নাফ্‌ছে আম্মারা" মানুষের অতি প্রবল শত্রু। ইহাকে দমন করিতে না পারিলে সাধকের যাবতীয় সাধনা ব্যর্থ। মানুষ এবং পশুতে যে প্রভেদ, সাধারণ মানুষ, জিতেন্দ্র মানুষে সে প্রভেদ। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খল এবং দুর্ব্বিনীত নাফ্‌ছকে হাতের মুঠার ভিতর আনয়ন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এই জন্য সাধককে কঠোর এবং প্রাণান্ত সংগ্রাম করিতে হয়।

বড় পীর সাহেবের এই সাধনা-জীবন পাঠ করিলে অবাক্‌-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। পাঠ্য জীবনে তিনি যে কঠোর কৃচ্ছ সাধনা করিয়াছেন, তাহা অন্য কাহারও দ্বারা আদৌ সম্ভব নহে। কুড়ি দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আহার জুটে নাই। কিন্তু বাহিরে তাহা কেহ জানিতে পারিত না। পড়া শেষ হইলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শুধু মাঠের লতা পাতা এবং শাক খাইয়া তিনি জীবন ধারন করেন। এই সময়ে তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। জীবনের কোনোও দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। শীতের সময় প্রতি বৎসর এক অপরিচিত ব্যক্তি পীর সাহেবকে একটি পশমের জামা দিয়া দিতেন। তিনি প্রায়ই নগ্ন-পদে কণ্টকময় ময়দানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। লোকে তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া জানিত।

এই সময়ে প্রায় একবৎসর যাবত বড় পীর সাহেব্ আদৌ পানি পান না করিয়া কেবল শাক পাতা খাইয়া থাকিতেন। পর বৎসর তিনি কোন কিছু আহার না করিয়া কেবল পানি পানে জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। তৃতীয় বৎসরে তিমি আদৌ আহার বা পানি পান করেন নাই কিম্বা ঘুমান নাই। আধ্যাত্মিকতার সুধা পান করিয়াই ওলিগণ বাঁচিয়া থাকেন!

নাফ্ছের সহিত দ্বন্দ করিতে করিতে বড় পীর সাহেব রাত্র দিবস কি এক অলক্ষ্য শব্দ শুনিতে পাইতেন। শব্দ শুনিয়া তিনি জঙ্গলে যাইয়া নানাভাবে চিৎকার করিতেন। ইহাতে লোকে তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে লইয়া গেল। কিন্তু সেখানে তাঁহার দশা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। কারণ যে মুক্ত পাখী ইচ্ছামত বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইবে, তাহাকে খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখিলে সে কতক্ষণ বাঁচিতে পারে? হাস্পাতালে বড় পীর সাহেবের অবস্থা একদিন এমন হইল যে, লোকেরা তাঁহাকে মৃত ধারণা করিয়া দফন কাফনের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাকে যেই গোছল দিয়া কাফন পরাইতে উদ্যত হইবে, অমনি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল বড় পীর সাহেব ইরাকের নির্জ্জন মরুভূমিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন। আহার নিদ্রা এই

সময়ে তিনি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ইহার পর ৪০ বৎসর তিনি প্রত্যহ এক অজুতে ফরজের নামাজ পড়িয়াছেন। ঈশার নামাজের পর বড় পীর সাহেব নিজের হাত দুইখানি খুঁটীর সহিত বাধিয়া এক পায়ে দাঁড়াইতেন এবং কোর-আনের প্রথম হইতে তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেন, ফজরের পূর্ব্বে তাঁহার এক খতম্ কোর-আন শেষ হইত।

———

হজরত খিজির কর্ত্তৃক আহার প্রদান

একবার বড় পীর সাহেব দীর্ঘ এগার বৎসর কাল এক নির্জ্জন গিরি-শৃঙ্গে অবস্থান করেন, তাহার এই অবস্থান স্থানটী "বোরজে আজমী" নামে খ্যাত। এইখানে থাকিবার সময় বড় পীর সাহেব খোদার নামে এই শপথ করেন যে, তাঁহার মুখে খাদ্য না পৌঁছা পর্য্যন্ত তিনি পানাহারে বিরত রহিবে। অতএব এই প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে অনশন করিতে হয়। কারণ খাদ্য দ্রব্য আপনা আপনি মুখে পৌঁছায় না। এইভাবে চল্লিশ দিন উপবাসের পর এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিয়া বড় পীর সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল। কিন্তু ক্ষুধায় জর্জ্জরিত হইতে থাকিলেও তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তাহা আহার করিলেন না। অথচ আত্মিকভাবে চারিদিক হইতে "ক্ষুধা" "ক্ষুধা" রব তাঁহার কানে

আসিতেছিল। তাঁহার মন চায় খাইতে, অথচ বিবেককে তিনি কিছুতেই বাধা দিতে পারিতেছিলেন না। এই সময় হজরত আবু সঈদ মোকার্‌মী সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বড় পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি ?" বড় পীর সাহেব কহিলেন, "নাফ্‌ছ বড় গোলমাল বাধাইতেছে ভাই, কিন্তু আমি অচল—অটল।" অতঃপর হজরত আবু সঈদ্ বড় পীর সাহেবকে কহিলেন, আর কত দিন এখানে থাকিবেন ? এখন বাড়ী চলুন! কিন্তু বড় পীর সাহেব স্থান-ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে হজরত খিজির (আঃ) একপ্রকার জোর করিয়াই বড় পীর সাহেবকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি যাইয়া দেখিলেন, হজরত আবু সঈদও তথায় উপস্থিত। হজরত খিজির (রঃ) বড় পীর সাহেবকে স্বহস্তে আহার করাইলেন।

হজরত রসুলে করিম ও হজরত আলী কর্ত্তৃক প্রেরণা লাভ

৫২১ হিজরীতে হজরত আবু সঈদ মোকার্‌মী "বাবুল আজাজ্‌" নামক স্থানে একটী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। উহাতে অধ্যাপনার ভার পড়ে বড় পীর সাহেবের উপর। তিনি পরম উৎসাহে ছাত্রদিগকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে বড় পীর সাহেব ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে হজরত রসুলে আক্‌রম (সঃ) তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করিতেছেন, হে আবতুল কাদের! তোমাকে মহিউদ্দীন আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, অতএব তুমি কেন সাধারণকে উপদেশ দিতেছ না? তাহাদিগকে ইসলামের বিমল আলো দেখাইতেছ না? হজরত বড় পীর সাহেব উত্তর দিলেন, "হুজুর! আমি আজমী, আরববাসীদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে আমার ভয় ও সঙ্কোচ হয়। কারণ তাহারা আজমীদের কথা, বাক্য এবং উচ্চারণকে ঘৃণা করিয়া থাকে।" ইহাতে হজরত রসুলে করিম (সঃ) রুহানীভাবে সাতবার বড় পীর সাহেবের মুখে থুথু প্রদান করিয়া কহিলেন, "যাও এইবার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বক্তৃতা করিতে থাক।" নামাজের পর বড় পীর সাহেব বসিয়া গেলে একদল লোক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া গেল। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে বড় পীর সাহেবের বুক কাঁপিতেছিল, তাঁহার মুখে কথা ফুটিতেছিল না। এমন সময়ে বড় পীর সাহেব দেখিলেন, হজরত আলি (কঃ) আত্মিক দেহে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট, তিনি বড় পীর সাহেবের মুখে ছয়বার থুথু দিলেন। ইহাতে তাঁহার সকল ভয়, ভীতি এবং সঙ্কোচ ঘুচিয়া গেল।

হজরত বড় পীর সাহেব বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট অথচ তেজোগর্ভ বক্তৃতা কাঁপিয়া কাঁপিয়া শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণে যেন সুধা ঢালিয়া দিতে লাগিল। প্রথমে লোক অবাক হইল, তাহার পর আত্ম-বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া পার্থিব সকল চিন্তা ভুলিল। হুজুর প্রথম প্রথম যখন বক্তৃতা দিতে আরম্ভ

করেন, তখন মুষ্টিমেয় লোক তথায় উপস্থিত থাকিত। কিন্তু যতই তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখনই লোক দিক-দিগন্ত হইতে আপনহারা হইয়া পতঙ্গপালের ন্যায় তথায় ছুটিতে লাগিল। এমন কি শেষে মাদ্রাসা গৃহ ও চতুষ্পার্শ্বের প্রাঙ্গন জনসমুদ্রের দৃশ্যে পরিণত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, তাঁহার মজলিসে এত বিপুল জনসমাগম হইলেও তথায় একটু টু শব্দ পর্য্যন্ত হইত না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে লোক সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত।

বড় পীর সাহেবের মজলিসে জ্বেন-দৈত্যের উপস্থিতি

শুধু যে মানুষ তাঁহার মজলিসে উপস্থিত হইত তাহা নহে, জ্বেন-দৈত্য দানব প্রভৃতিও তথায় হাজির থাকিত। আবু নসর বাগদাদী বলিয়াছেন, আমি একবার মন্ত্র দ্বারা একদল জ্বেনকে আহ্বান করিলাম, কিন্তু তাহারা অনেক বিলম্বে আমার নিকট উপস্থিত হইল, ইহা নিয়মের বিপরীত, সুতরাং আমি অবাক হইয়া তাহাদিগকে এই অযথা বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা কহিল, যখন শেখ আবদুল কাদের (রঃ) বক্তৃতা করিতে থাকেন, তখন কদাচ আমাদিগকে

আহ্বান করিও না। আবু নসর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? ইহার কারণ কি? তাহারা কহিল, আমরা তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য সদলে তথায় উপস্থিত হইয়া থাকি, তাঁহার মজলিসে মানুষের চেয়ে আমাদের জনতা অধিক হইয়া থাকে। আমরা সমগ্র জ্বেন সম্প্রদায় তওবা করিয়া তাঁহার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি।

অদৃশ্য হইতে জনৈক স্ত্রীলোকের কেশবাধা রুমাল উড়িয়া আসার দৃশ্য

পীর আবুল কাসেম বলিয়াছেন, আমি বড় পীর সাহেবের কুরসির নিম্ন দেশে উপবেশন করিতাম, তথায় কতকগুলি কাল সর্পের ন্যায় ভীষণাকৃতির লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিতাম। একদিন উপদেশ দান কালে হুজুরের পাগ্‌ড়ীর এক প্রান্ত খুলিয়া নিম্নে লুটাইয়া পড়িল, হুজুর তখন সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতির সাগরে নিমগ্ন। শ্রোতৃগণ ইহা দেখিয়া নিজ নিজ পাগড়ী হুজুরের পদপ্রান্তে স্থাপন করিল।

অতঃপর বড় পীর সাহেবের উপদেশ প্রদান শেষ হইলে তিনি তাঁহার পাগড়ী ঠিক করিয়া লইয়া বলিলেন, হে আবুল কাসেম, তুমি লোকদের পাগড়ীগুলি ফেরৎ দিয়া দাও। আমি তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তদ্‌সমুদয় লোকদিগকে ফেরৎ

দিয়া দিলাম, কিন্তু একখানি রুমাল মাত্র বাকী রহিয়া গেল। অথচ তাহার কোন দাবীদার পাওয়া গেল না। তাহা ছাড়া লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, উহা কোন স্ত্রীলোকের মাথার চুল বাধা রুমাল। বড় পীর সাহেব রুমালখানি তুলিয়া লইয়া স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন, কিছুক্ষণ পরে রুমাল খানি তাঁহার মস্তক হইতে গায়েব্ হইয়া গেল। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া আবুল কাসেম বড় পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর! এই মজলিসে কোন স্ত্রীলোক নাই, অথচ এখানে তাহাদের একখানা মাথার রুমাল পাওয়া গেল, হুজুর তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন, কিন্তু এখন তাহাও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ইহার রহস্য আমাদিগকে বলিয়া দিয়া আমাদের কৌতূহল দূর করুন। গওসল আজম কহিলেন—হে আবুল কাসেম, রুমালখানি ইসপেহানবাসিনী আমার এক ভগ্নির। তোমাদের পাগড়ী নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ঐ সুদূর হইতে জানালা দিয়া সেও উহা ফেলিয়া দেয়। পরে তোমরা নিজ নিজ পাগড়ী তুলিয়া লইলে সেও হাত বাড়াইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে।

বড় পীর সাহেবের কথার প্রভাব

গওসল আজম হজরত বড় পীর সাহেবের কথায় এমন মাদকতা ছিল যে, সামান্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি কথা বলিলেও লোক তন্ময় হইয়া তাহা শুনিত। এমন কি প্রত্যেক কথাটি তীরের মত শ্রোতার অন্তর্দ্দেশে বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। বড় পীর সাহেবের এক পুত্র শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিদেশ হইতে বহু বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং পিতাকে কহিলেন—হুজুর! আমি আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতে বাসনা রাখি। বড় পীর সাহেব তাঁহাকে এই কার্য্যে অনুমতি দিলেন। অতঃপর শেখ আব্দুর রাজ্জাক পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু একটি লোকের প্রাণও তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে ছিল না। অথচ তিনি সুন্দরভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন। অবশেষে লোক বিরক্ত হইয়া বড় পীর সাহেবকে কহিল, হুজুর! আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিন। তখন হুজুর উপদেশ দিতে উঠিয়া বলিলেন—"গতকল্য আমি রোজা রাখিয়াছিলাম। এহইয়ার মাতা আমার জন্য কয়েকটি ডিম ভাজিয়া একখানি রেকাবীতে উহা কাঁচের একটি বড় বুয়মের উপর রাখিয়া দেয়, এমতাবস্থায় একটি বিড়াল উহা ফেলিয়া দিলে রেকাবীটা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল।" এইটুকু বলার পর সভাস্থ লোকেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেহ কেহ বেহুশ্ হইয়া গেল।

আমার কদম প্রত্যেক ওলীর গ্রীবা দেশে রহিয়াছে

বড় পীর সাহেবের পুত্র শেখ আব্‌দুল ওহাব্, আব্‌দুল্লাহ্ এবং এব্‌রাহিম হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক মজলিসে বড় পীর সাহেব ঘোষণা করিলেন যে, "আমার কদম প্রত্যেক ওলীর গ্রীবা দেশে থাকিবে।" ঐ সময়ে এরাকের পঞ্চাশ জন পীর উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অবনতভাবে নিজ নিজ গ্রীবা-দেশ পাতিয়া দিয়াছিলেন।

পীর আবু সা'দ কিলাবী বলিয়াছেন, যে সময় হজরত বড় পীর সাহেব ঘোষণা করিয়াছিলেন—"আমার এই কদম প্রত্যেক ওলীর গ্রীবাদেশে রহিয়াছে"—সেই সময়ে একদল ফেরেশ্‌তা হজরত নবী করিম (সঃ) এর পক্ষ হইতে একখানি মূল্যবান্ বস্ত্র আনিয়া সকল ওলীর সমক্ষে বড় পীর সাহেবকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। জীবিত ওলীগণ সশরীরে এবং মৃত ওলীগণ আত্মিকরূপে উক্ত মহফিলে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এমন কি মহফিলের চতুর্দ্দিক ও শূন্যপথ ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই সময়ের প্রত্যেক ওলী স্ব স্ব গ্রীবাদেশ লম্বা করিয়া দিয়া বড় পীর সাহেবের এই ঘোষণাকে সমর্থন করিয়াছিলেন।

কোতব্ লুলু আবমিনী বলিয়াছেন, যে সময়ে বড় পীর

সাহেব বলিয়াছিলেন—"আমার কদম প্রত্যেক ওলীর গ্রীবাদেশে রহিয়াছে"—তখন সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১৩ জন ওলী ছিলেন, তন্মধ্যে মক্কা ও মদিনা শরিফে ১৭ জন, এরাকে ৬০ জন, আজমের বিভিন্ন স্থানে ৬০ জন, শাম দেশে ৩০ জন, মিসরে ২০ জন, প্রাচ্যদেশে ২৭ জন, এয়মনে ২৩ জন আবিসিনিরায় ১১ জন, ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরের মধ্যে ৭ জন, সারহান্দিপে (সিংহলে) ৭ জন, ককেসাস পর্ব্বতে ৪৭ জন এবং সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপগুলিতে ১৪ জন ওলী-আল্লাহ্ ছিলেন। আজমের একজন ওলী ব্যতীত সকলেই পীর সাহেবের ঐ ঘোষণা সমর্থন করিয়া ছিলেন। এই বিদ্রোহী ওলীটির পীরত্ব কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল।

একজন পাদ্রীকে বড় পীর সাহেবের নিকট ইসলাম গ্রহণ করিতে হজরত ঈসার আদেশ

একদিন বড় পীর সাহেব উপদেশ দানের পর বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন পাদ্রী দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, হুজুর! আমি আপনার হস্তে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। হজরত বড় পীর সাহেব তাহাকে তওবা করাইয়া ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করাইলেন।

অতঃপর ঐ নবদীক্ষিত পাদ্রী দণ্ডায়মান হইল এবং সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "বন্ধুগণ! আমি একজন এয়মনবাসী পাদ্রী, যুগ যুগ ধরিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া

আসিতেছি। আমি আজ হঠাৎ কিসের প্রলোভনে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, সেই সম্বন্ধে কাহারো কাহারো মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমি যাবতীয় পার্থিব প্রলোভনের বাহিরে থাকিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। আমার ইস্‌সাম গ্রহণের মূলে রহিয়াছে এক স্বর্গীয় ঈঙ্গিত। সারাদিন খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের পর একদা আমি রাত্রিতে ঘুমাইয়া আছি, এমন সময়ে স্বপ্নে দেখিলাম, আমাদের নবী হজরত ঈসা আমার সম্মুখে উপস্থিত, তিনি আমার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিতেছেন,—বৎস! বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবের হস্তে ইস্‌লাম গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য ও গৌরব লাভ কর। আমি স্বপ্নঘোরে জিজ্ঞাসা করিলাম—হুজুর! তিনি কে? হজরত ঈসা কহিলেন: ইনিই বাগদাদের অধিবাসী গওসল আজম শেখ আব্‌দুল কাদের জিলানী।

বড় পীর সাহেবের বক্তৃতায় অলৌকিক ক্ষমতা

হজরত বড় পীর সাহেবের ওয়াজের মজলিসে কখনও কখনও সত্তর-আশি হাজার এমন কি তাহাপেক্ষা অধিক শ্রোতার সমাগম হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এত জন-সমুদ্রের মধ্যে তিনি ওয়াজ করিতে উঠিলে মনে হইত যেন এক বড় পীর সাহেব ছাড়া সেখানে আর কোন প্রাণীই নাই, একটি লোকও কথা বলা দূরে থাকুক, জোর করিয়া নিঃশ্বাসও ফেলিত

না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, এত লোক এক সঙ্গে বসিয়া বক্তৃতা শুনিলেও তথায় দূর কিম্বা নৈকট্যের কোন পার্থক্য ছিল না। প্রত্যেকটি লোক সমান ও স্পষ্টভাবে পীর সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে পাইত। ইহা বড় পীর সাহেবের একটা জ্বলন্ত কারামত। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, যে যতই গলাবাজী করুন না কেন, ১০।১৫ হাজার শ্রোতার বেশীকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব নহে। কিন্তু বড় পীর সাহেবের শক্তির সীমা ছিল না।

আধুনিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব

আজকাল বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে নানা অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। যে কোন স্থানে 'রেডিও' যন্ত্র বসাইয়া আমরা হাজার হাজার মাইল দূরের বক্তৃতা অতি অবাধে শুনিতে পারি। সভায় বেশী লোকের সমাগম হইলে, তখন বক্তাকে মাইক্রফোনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে হয়, এবং তাহা লাউড্ স্পীকারের সাহায্যে যত লোক ইচ্ছা শুনিতে পারে। বড় পীর সাহেবের জামানায় বিজ্ঞানের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি ছিল না, তাই খোদাতায়ালা তাঁহার মধ্যে এমন ঐশী-শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান তাহার নিকট পরাস্ত। শত শত বৎসর গবেষণার পর এবং অযুত অর্থ ব্যয় করিয়া বিজ্ঞান যাহা দান করিয়াছে, একটী মানুষের সাধারণ কর্ম্মশক্তি তাহাপেক্ষা

কত প্রবল ছিল, নিম্নের এই উপাখ্যানটী পড়িলে তাহা অতি সহজে বুঝা যাইবে।

বড় পীর সাহেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত হজরত আদী বিন্ মোসাফির বাগদাদ হইতে বহুদূরে বাস করিতেন। সময় ও সুযোগ অভাবে তিনি বড় পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অমূল্য বক্তৃতা শুনিতে পারিতেন না। তাই বড় পীর সাহেবের ওয়াজের সময় হইলে তিনি তাঁহার বাসস্থান হইতে বাহির হইয়া এক পর্ব্বতের পাদমূলে যাইয়া বসিতেন। অতঃপর একখণ্ড ছড়ি দিয়া তথায় একটী বৃত্তাকারে রেখা টানা হইত। হজরত আদী তাঁহার অনুচরবর্গকে ঐ সীমারেখার মধ্যে বসিতে বলিতেন। অতঃপর হজরত বড় পীর সাহেবের বক্তৃতার ঝঙ্কার তাঁহাদের কর্ণে আসিয়া পৌছিত। তাঁহারা মনে করিতেন, মেঘের মিনারে দাঁড়াইয়া বড় পীর সাহেব যেন গুরু গম্ভীর ভাষায় তাঁহাদিগকে বক্তৃতা শুনাইতেছেন।

একজন বাদ্যকরের তওবা করিয়া সাধু হইবার কথা

একদিন বড় পীর সাহেব বক্তৃতা দিতেছেন, অসংখ্য লোক চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইয়া তাহা শুনিতেছে, সহসা বক্তৃতার মাঝে তিনি থামিলেন এবং উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"কে আমাকে এখনই একশত দীনার ধার দিতে

পারে ?" এই কথা শুনিয়া বহুলোক মুদ্রা হস্তে হজরত বড় পীর সাহেবের দিকে ছুটিল। তিনি একজনের নিকট হইতে ঐ মুদ্রা গ্রহণ করিলেন এবং তাহা আবু রেজা নামক তাঁহার এক খাদেমের হস্তে দিয়া কহিলেন—"আবু রেজা! শীঘ্র এই টাকাগুলি লইয়া "শুনিজিয়া" গোরস্তানে চলিয়া যাও, তথায় যাইয়া দেখিতে পাইবে একজন অতি বৃদ্ধ লোক বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে,তাহাকে উহা দিয়া দিও।" আবু রেজা তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া বীণা বাদককে পাইল এবং তাহার হস্তে ঐ একশত দীনার তুলিয়া দিল। ইহা দেখিয়া বীণাবাদক সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা অবস্থায় মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান ও চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে আবু রেজাকে কহিল, ভাই! এই টাকা কে পাঠাইয়াছেন? আবু রেজা উত্তর করিল, —আমাদের গওসল্ আজম্। বীণাবাদক তাহার সেই ভগ্ন বীণাটী কাঁধে লইয়া আবু রেজার সহিত বড় পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইল। বড় পীর সাহেব তাহাকে পরম সমাদরে নিজের কাছে বসাইলেন এবং উপস্থিত লোকদের সমক্ষে তাহার জীবনের চাঞ্চল্যকর ইতিহাস বর্ণনা করিতে আদেশ দিলেন। বীণাবাদক কহিল—"আমি যৌবনে একজন অতি উচ্চদরের এবং নামজাদা বাদ্যকর ও গায়ক ছিলাম। দেশ বিদেশে আমার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রাজা, মহারাজা এবং নবাব-সুবা ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে আমার গান শুনিবার সৌভাগ্য হইত না। বড় লোকদের মনস্তুষ্টি করিতে পারায় রাশি রাশি ধনদৌলত আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইত, আমিও তাহা পানির

মত ব্যয় করিতাম। আমার এই সৌভাগ্য দেখিয়া অনেকেই হিংসা করিত। কিন্তু বন্ধুগণ! বর্ত্তমানে আমি বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত, বীণা বাজাইতে গেলে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতায় হাত কাঁপিতে থাকে। স্খলিত দন্তে আর পূর্ব্বের ন্যায় মুখ হইতে সেই কোকিল-কণ্ঠ বাহির হয় না, সুতরাং এখন আমার সেই পূর্ব্ব গৌরব এবং দিগন্ত বিস্তৃত সুখ্যাতি আর নাই। কেহ আমাকে আর ডাকে না। তাই আমি মনে করিয়াছি, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া ইহজগতের লোক যখন আমাকে সমাদর করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তখন পরজগতের লোককে আমি প্রাণ ভরিয়া আমার সঙ্গীত ও বাদ্য শুনাইব, কারণ তথায় আদর-অনাদরের প্রশ্ন নাই। পরিশ্রমের পুরস্কার খোদার হাতে, তাহা আমি পাইয়াছি। একদিন আমি সেতারা বাজাইয়া গান গাহিতেছি, এমন সময় এক মৃত ব্যক্তি কবর হইতে মাথা উত্তোলন করিয়া কহিল, "হে বাদক! কতদিন আর মৃত ব্যক্তি-দিগকে তুমি গান শুনাইবে?" আমি তাহা শুনিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে চৈতন্যহারা হইয়া পড়িলাম, কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না। সেতারা বাদকের এই অপূর্ব্ব আত্মকাহিনী শুনিয়া উপস্থিত সকলেই যাহার পর নাই বিস্মিত হইল। অতঃপর লোকটি তাহার অতি সাধের বাদ্যযন্ত্রটা এক আছাড়ে চূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং আজীবন বড় পীর সাহেবের সাহচর্য্যে থাকিয়া অশেষ কামালিয়াত হাসেল করিল।

বড় পীর সাহেবের মুখের উপর বেল্লাওরের ফানুশের জ্যোতিঃ

হজরত আবু হাফ্‌স ওমর বলিয়াছেন, আমি বড় পীর সাহেবের সভায় উপস্থিত হইলে একটী অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য অবলোকন করিতাম। আমি দেখিতে পাইতাম, আস্‌মান ভেদ করিয়া একটী বেল্লাওরের ফানুশ যেন নিম্নে বিলম্বিত হইয়াছে, এবং তাহার জ্যোতিঃ বড় পীর সাহেবের মুখের উপর পতিত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল কি যেন এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুষমায় ভরিয়া তুলিয়াছে। একদিন আমি এই অপার্থিব ঘটনা লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিব মনে করিয়া যেই দণ্ডায়মান হইয়াছি, এমন সময় হুজুর আমাকে হাতের ইশারায় বসিতে বলিলেন। আমি ভয়ে ও ত্রাসে বসিয়া পড়িলাম। তাঁহার দরবারে আসিয়া আমি সভায় বহু আশ্চর্য্য কেরামত পরিলক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু হুজুর বাঁচিয়া থাকিতে কোন দিন তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই। হজরত আবু হাফ্‌স ওমর আরও বলিয়াছেন, আমি একদিন হুজুরের মজলিসে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম, এই অবস্থায় হঠাৎ স্বপ্নে দেখিতেছি, যেন বেহেশ্‌ত রাজ্য হইতে ফেরেশ্‌তা এবং হুর-সুন্দরিগণ মজলিসের দিকে লক্ষ্য করিয়া বিচিত্র বর্ণের মূল্যবান বস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতেছে। জাগরিত হইয়া হুজুরের একটী কথা আমার

স্মরণ হইল, তিনি বলিয়াছিলেন, "হে ওমর। কখনও আমার সভায় যোগদানে ক্রটী করিও না, কারণ তথায় আল্লাহ্‌র রহমত্‌ধারা বস্ত্রাকারে বর্ষিত হইয়া থাকে।"

নির্ভিকভাবে অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ

হজরত বড় পীর সাহেব বক্তৃতাস্থলে অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কখনই ভীত হইতেন না। খলিফার কোন অন্যায় দেখিলেও তিনি নির্ভিকভাবে তাহার প্রতিবাদ জানাইতেন। একবার খলিফা মোক্‌তাজালে আম্‌রিল্লাহ, আবু ওফা এহইয়া নামক একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোককে 'কাজীওল কোজ্জাত্‌' বা প্রধান বিচারকের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে সমগ্র মুস্‌লিম জগতে এক চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। কিন্তু খলিফার কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সাহস কাহারও হইল না। বড় পীর সাহেব এক দিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে এমন জলন্ত ভাষায় এই নিয়োগের প্রতিবাদ করিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া খলিফা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং তখনই সেই নিয়োগ বাতিল করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বড় পীর সাহেবের বক্তৃতা

বড় পীর সাহেব অতি সাধারণ ভাবে লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন, অথচ তাহা লোকদের প্রাণের অন্তঃস্তল স্পর্শ করিত। শ্রোতৃবৃন্দ তন্ময় হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বক্তৃতা শুনিত। এমন কি অনেকেই কাঁদিয়া বুক ভাসাইত। হজরত বড় পীর সাহেবের একটী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ "তোহফায়ে সোভ্‌হানী" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল। আলোচ্য বক্তৃতাটী তিনি ৫৪০ হিজ্‌রীর ৩রা সাওয়াল মোসাফির খানার প্রাঙ্গনে সমবেত জন সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া দিয়া ছিলেন।

ভদ্রমহোদয়গণ! মহা পরীক্ষা স্বরূপ খোদার নিকট হইতে যে বিপদ নাজেল হয়, তাহাতে ভাবিও না, অথবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিও না, আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিও। মোমেনের অন্তরে কি এবং কেন-এর প্রশ্ন আসিতে পারে না। সকল সময় মানুষকে ঐশ-মহাপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নাফ্‌ছ মানুষের পরম শত্রু। ইহার সহিত সংগ্রাম করিয়া এই দুষ্টমতি শত্রুকে পরাস্ত করিতে হইবে। নাফ্‌ছকে দমন করিতে না পারিলে এবাদত রেয়াজতের সাফল্য লাভ হয় না। সমস্ত দুষ্কার্য্য এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিয়া আল্লাহর পথে মনকে ধাবিত করার নামই নাফ্‌ছ দমন। এই অবস্থায় নাফ্‌ছের নাম নাফ্‌ছে মোতমাইন্না"। আল্লাহ ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া

বলিয়াছেন, "হে শান্তিপূর্ণ নাফ্ছ! তুমি তোমার প্রভুর দিকে ফিরিয়া যাও, তুমিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।"

এই নাফ্ছ খোদার দিকে রুজু হয়, এবং ইহার দুষ্টামীর পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং মায়া-মমতার স্পৃহা তখন তিরোহিত হইয়া মানুষকে আত্মিক শক্তি সম্পন্ন করিয়া তোলে। তখন মানুষের মন হজরত এব্রাহিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। কারণ কোনও প্রকার পার্থিব ভোগ-লালসা এবং শয়তানের প্ররোচনা তাঁহাকে কখনও কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। সেই জন্য তিনি এক অনাবিল শান্তির অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু বা জীবজন্তু তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিত এবং তাঁহার সেবাকে পরম সৌভাগ্য বলিয়া জানিত। হজরত এব্রাহিম যখন নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে পতিত, সহস্র লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া যখন আগুন তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তখন জিব্রাইল, মিকাইল প্রভৃতি খোদার মোকার্বীন ফেরেশতাগণ তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, এবরাহিম! তুমি খোদার নিকট 'পানাহ্' চাও। ইহা শুনিয়া হজরত এব্রাহিম্ তাহা-দিগকে বলিলেন, আমি আমার এই অবস্থাকে খোদার নিকট পানাহ চাহিবার উপযুক্ত মনে করি না, কারণ, খোদা তায়ালা আমার অবস্থা সম্যক অবগত রহিয়াছেন। তোয়াক্কোলের কি অসীম মহিমা দেখুন! অতঃপর হজরত এব্রাহিমের এই ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড সুশীতল পুষ্পবনে পরিণত হইয়াছিল।

ধৈর্য্যশীল লোকের প্রতি ইহজগতে এবং পরজগতে খোদার পুরস্কার অফুরন্ত। খোদা বলিয়াছেন, "অসীম পুরস্কার ধৈর্য্য-শীলদের প্রতি প্রদত্ত হইবে।" কেবল মাত্র খোদার জন্যই ধৈর্য্যশীলগণ যাহা নীরবে সহ্য করিয়াছে, তাহা কখনই ব্যর্থ যাইবে না। খোদার জন্য এক ঘণ্টা ধৈর্য্য অবলম্বন কর এবং বহু বৎসর তাহার ফল ভক্ষণ করিতে থাক, মনে রাখিও ধৈর্য্যশীলতা শ্রেষ্ঠ জেহাদ্। খোদা ধৈর্য্যশীলদের অতি নিকট। ধৈর্য্যশীল হও, দেখিও তোমার আত্মরক্ষার আর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে সতর্ক হও, একদিন তোমার সম্মুখে তোমার সদসৎ কার্য্যের চিত্র ধরা হইবে, সুতরাং তাহার পূর্ব্বে তুমি সাবধান হও, কারণ লজ্জা পাওয়ার পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করা দরকার। তোমার অন্তরকে পবিত্র এবং নির্ম্মল কর। তোমার অন্তর যে সময় খাঁটী ও বিশুদ্ধ হইবে, তখন তোমার কোনই পীড়া থাকিবে না। হজরত বলিয়াছেন, মানুষের দেহে একখণ্ড মাংসপিণ্ড রহিয়াছে, যখন ইহা সুস্থ থাকে, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুস্থ থাকে, কিন্তু ইহা বিকৃত হইলে তাহার সর্ব্বশরীর পীড়িত হইয়া পড়ে। মনে রাখিও, এই মাংস পিণ্ডখানির নাম হৃৎপিণ্ড। ইহাকে সংশোধন করার নাম খোদার প্রতি আত্মসমর্পন—এবং তাঁহার তওহীদ ও অনুগ্রহের উপর মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন। যখন এই সমস্ত গুণের কোন একটীর অভাব হয়, তখনই হৃৎপিণ্ড পীড়িত হইয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ড পাখীর তুল্য, এবং দেহ ইহার পিঞ্জর, অথবা সুদৃঢ় আলমারী কিংবা প্রকোষ্ঠে রক্ষিত

বহুমূল্য রত্নরাজির ন্যায়। পাখী না থাকিলে খাঁচার প্রয়োজন নাই, কিংবা ধনরত্ন না থাকিলে আলমারীর প্রয়োজনীয়তা কি আছে ? হে প্রভু ! আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে তোমার এবাদতে নিয়োজিত থাকিবার তওফীক্ দাও। আমার অন্তর তোমার দিকে সর্ব্বদা রুজু থাকুক, রাতদিন তোমার চিন্তায় আমার মুহূর্ত্তগুলি কাটুক। হে প্রভো ! সাধুদের সদ্সঙ্গ আমাকে দান কর—যাঁহারা তোমার নিয়ামত এবং অনুগ্রহ লাভে ধন্য হইয়াছেন এবং যাঁহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ। —আমীন।

হে মানবমণ্ডলী, আল্লাহ তায়ালার আজ্ঞানুবর্ত্তী হও, যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী জামানার সাধুপুরুষগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, যেহেতু তাঁহাদের ন্যায় তোমরাও খোদার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হইবে। যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, খোদা তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন তাহা হইলে তাঁহারই এবাদত কর, তাঁহার পরীক্ষায় ধৈর্য্যহারা হইও না, তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাক। সৎ লোকেরা খোদাকে ভয় করেন, তাঁহারা খোদাভীতি এবং ধর্ম্ম-পরায়ণতার দ্বারা লোকের হৃদয় জয় করিয়া থাকেন। পর-লোকের মুক্তি ইঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য। ইঁহারা প্রথমে নিজের নাফ্‌ছকে উপদেশ দিয়া তাহাকে সংযত করেন, পরে অন্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

হে খোদার বান্দা সকল ! নিজের নাফ্‌ছকে প্রথমে উপদেশ দাও, পরে অন্যকে উপদেশ দিও। নিজের মন ও আত্মাকে কলুষিত রাখিয়া পরকে উপদেশ দিতে যাইও না। আক্ষেপ !

তুমি নিজে ডুবিয়া যাইতেছ, পরকে কি প্রকারে উদ্ধারের বাসনা রাখ। তুমি স্বয়ং অন্ধ, কি করিয়া তুমি পরকে পথ দেখাইতে চাও। যে সুনিপুণ সাঁতারু, সেই সমুদ্রে নিমজ্জিত অপরকে রক্ষা করিতে পারে। তরিকত মারেফাতের চক্ষু যাহার উন্মীলিত সেই কেবল লোকদিগকে সরল পথ দেখাইতে সক্ষম।

যতদিন পর্য্যন্ত তুমি খোদাকে ভালবাসিবে এবং তাঁহারই জন্য সৎকার্য্যসকল করিবে এবং যতদিন তুমি খোদাকে ভয় করিবে, এবং তাহার নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি করিতে বিরত রহিবে, তত দিন পর্য্যন্ত খোদার কোন কার্য্যকে তুমি বিরুদ্ধ-ধারণার সহিত গ্রহণ করিতে পারিবে না। অন্তর পরিশুদ্ধির উপর এই অবস্থা নির্ভর করে। যখন তওহীদকে দরজার সম্মুখে স্থাপন করিয়া শের্ককে গৃহের ভিতরে স্থান দিয়াছ, তখন ইহাকে মোনাফেকী ব্যতীত আর কি বলা যায়? দুঃখের বিষয়, তুমি কাথায় সাধু, কিন্তু তোমার কার্য্য জঘন্য এবং পাপজনক। তোমার ওষ্ঠ খোদার শুকর গোজারী করিতে থাকিলেও তোমার অন্তর ঘোর অতৃপ্ত। খোদা বলিয়াছেন—"হে আদম সন্তান! আমা কর্ত্তৃক তোমার প্রতি ভাল প্রেরিত হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার নিকট হইতে মন্দ ব্যতীত পাওয়া যায় না।" হায়! তুমি খোদার দাস বলিয়া দাবী কর, অথচ তুমি মনেপ্রাণে অন্যের দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ। যদি তুমি প্রকৃতই খোদার দাস হইতে, তাহা হইলে তুমি তাঁহার মিত্রকে মিত্র জানিতে এবং তাঁহার শত্রুকে শত্রু জানিতে। প্রকৃত মোমেন যাঁহারা—তাঁহারা কখনই নাফছের বশীভূত হয়েন না,

কিম্বা শয়তান অথবা প্রলোভন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারেনা। তাঁহারা শয়তানের পক্ষে ভীতি ও বিভীষিকা স্বরূপ। খোদার রেজামন্দি ইহাদের চরম ও পরম লক্ষ্য। দুনিয়ার কোনও ভ্রূকুটিতে ইহারা আদৌ ভীত নহেন। ইহারা আয়েশ-আরামের লোভী নহেন বরং মনের শান্তি ইহাদের কাম্য। প্রতি মুহূর্ত্তে খোদারই জন্য ইহারা এবাদত করিয়া থাকেন। ভ্রাতৃগণ! খোদার ঘোষণা শ্রবন করুন, খোদা বলিয়াছেন, "আমি মানুষ এবং জ্বেনকে আমার এবাদতের জন্য ব্যতীত সৃষ্টি করি নাই।"—"তোমরা খোদার সহিত কাহাকেও অংশী স্থাপন করিও না।" খোদাকে একক বলিয়া বিশ্বাস কর। তিনি সর্ব্ব বিষয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা,তাঁহারই অধীনে সর্ব্ব ক্ষমতানিহত।

যাহারা খোদা ব্যতীত অন্যকে অনুসন্ধান করে, তাহারা নির্ব্বোধ। খোদার শক্তি-ভাণ্ডারের বাহিরে আর কি কিছু রহিয়াছে? সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ বলিয়াছেন,"ইন্নাল্লাহ আলা-কুল্লে শাইয়েন কাদির"—অর্থাৎ আল্লাহ সর্ব্বশক্তির মালিক।

হে আল্লাহর বান্দা সকল! তক্দিরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে। যদি খোদার অফুরন্ত নিয়ামতের অধিকারী হইতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহকে বিস্মৃত হইও না। তোমা-দের উপর খোদার অনুগ্রহধারা এমন ভাবে বর্ষিত হইবে যে, যাহা তোমারা কোন দিন কল্পনাও কর নাই। হে লোকসকল! তক্দিরের অবশ্যম্ভাবী পরিনামের উপর সন্তুষ্ট থাক। বলা বাহুল্য এই বিষয় আমাকে খোদার পথে অগ্রসর হইবার অধিকতর সাহায্য প্রদান করিয়াছে।

হে লোকসকল! আইস, খোদার পথে অগ্রসর হইবার যাবতীয় বাধা বিঘ্ন আমরা অতিক্রম করিয়া চলি, এবং আমাদের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য মস্তক তাঁহারই উদ্দেশ্যে নত করি। তক্‌দিরের উপর মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমাদের যাত্রাপথ সুগম করিতে হইবে। তোমার পানীয় তাঁহার জ্ঞানের সমুদ্র হইতে—তোমার খাদ্য তাঁহার অনুগ্রহের দস্তখান্ হইতে সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহার অনুগ্রহ তোমার সর্ব্ববিধ কল্যানের কারণ।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সর্ব্বদা শরিয়তের বিধি বিধান সমূহ পালন করিয়া চল, এবং দুষ্ট নাফ্‌ছ, কুচিন্তা, মালাউন ইব্‌লিস এবং দুষ্ট সঙ্গীদের সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম কর। এই সংগ্রামে প্রকৃত সৈনিক যাঁহারা, তাঁহারা কখনই নিজেদের শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলেন না, কিম্বা অসি কোষাবদ্ধ করেন না। অথবা ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে নিচে নামেন না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ যুদ্ধ সাজে সুসজ্জিত থাকেন। ওলীদের মত ইহারা আহার নিদ্রাকে জয় করিয়া থাকেন। আবশ্যক ব্যতীত ইহারা কথা বলেন না। আমাদের পদদ্বয় সচল এবং জিহ্বা বাকশক্তি সম্পন্ন, ইহা খোদারই অনন্ত মেহেরবাণীর ফল। কেয়ামতের দিন তোমাদের হস্তপদ সাক্ষ্য প্রদান করিবে, ইহাও তাঁহার অসীম শক্তির পরিচায়ক। তিনি প্রত্যেক ইতর প্রাণীর কণ্ঠেও ভাষা দিয়াছেন, ইহার দ্বারা পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে। খোদা ইচ্ছা করিলে যে কোন বস্তুকে যে কোন কার্য্যের উপযুক্ত করিতে পারেন। তিনি মানব সমাজের গাত্র হইতে শের্ক

কালিমা দূরীভূত করিবার জন্য বহু নবী পায়গম্বর পাঠাইয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকই ঐশ-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। নবীর যুগ শেষ হইয়াছে এখন আলেমগণ তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাই বিশ্বনবী বলিয়াছেন—"আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।"

হে লোকসকল! খোদার অনুগ্রহ সমূহকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ কর। উৎকৃষ্ট বিষয় সমূহ উপভোগ করিয়া তুমি যে আনন্দ লাভ কর, তাহা খোদারই প্রদত্ত। বন্ধুগণ! তোমাদের নির্জ্জনে বসিয়া ঐশ-চিন্তা সার্থক হইবে, তোমাদের হৃদয়ে পাপের কালিমা স্পর্শ করিতে পারিবে না, যদি তোমরা প্রকৃত সাধক হও। সাধু ও বিদ্বান লোকের ধ্বংস— মানব সমাজের পক্ষে ভীষণ অকল্যাণ কর। "আব্দাল" "সিদ্দিক" প্রভৃতি উচ্চ স্তরের সাধকগণ পৃথিবীর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। ইঁহাদের কার্য্য পৃথিবীর মঙ্গল সাধন, ইঁহাদের কর্ম্ম ক্ষেত্র আরশের নিম্ন স্থল হইতে পৃথিবীর কেন্দ্র স্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

হে আল্লাহর বান্দাসকল! নাফ্‌ছ এবং কামনার বশীভূত হইও না এবং সাধু মহাপুরুষদের পদধূলিতে পারিণত হও। কারণ তাঁহাদের সম্মুখে তোমরা মাটীর ঢেলা বিশেষ। খোদা বলিয়াছেন, "তিনি মৃত হইতে জীবিত করেন এবং জীবিতকে মৃত করেন।" তিনি কাফের তনয় হজরত এব্‌রাহিমকে অন্যতম নবুওয়াতের আসন প্রদান করিয়া ছিলেন। মোমেন ব্যক্তি জীবিত এবং কুফর মৃত বিশেষ। একেশ্বরবাদী জীবিত এবং মোশ্‌রেক মৃত। এই কারণে খোদা তায়ালা হাদিস কুদসীতে

বলিয়াছেন ঃ আমার সৃষ্ট রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম শয়তানের মৃত হয়। কারণ যে আমার আদেশ অমান্য করিয়াছিল, তাই তাহার পাপে মৃত হইয়াছে।

এই যুগে মোনাকেফী এবং মিথ্যাচার মানুষের নীতিতে পরিণত হইবে। সাবধান! কপট, মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক-দিগের সহিত সংসর্গ রাখিও না। ইহা পরম পরিতাপের বিষয় যে, তোমার আত্মা কলুষিত, জড়বাদী, কামনার দাস এবং মোশরেক, অতএব কি করিয়া তুমি এহেন আত্মা দ্বারা সুফল আশা করিতে পার। তোমার কুপ্রবৃত্তিকে ঢিলা করিও না, সর্ব্বদা ইহার প্রতিকূলে কার্য্য করিবে। নাফ্ছের সহিত যেমন কুকুর তেমনি মুগুর-এর নীতি পালন করিবে, নচেৎ সে তোমাকে সহজে বিপন্ন ও পথভ্রষ্ট করিতে পারে। কঠোর তপস্যার দ্বারা কুপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন করিবে। তুমিই কুপ্রবৃত্তিকে জয় করিবে, তোমাকে যেন ইহা প্রভাবান্বিত করিতে না পারে। পার্থিব আশক্তির বশীভূত হইও না। কারণ ইহা অতি নগন্য এবং বিশেষত্বহীন ব্যাপার। তুমি ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্য দিয়া বৃহৎ বস্তু কি করিয়া লাভ করিতে পার? শয়তান তোমাদের মারাত্মক শত্রু। স্মরণ কর তোমাদের আদি পুরুষ হজরত আদমকেও শয়তান এক হাত দেখাইয়া ছিল। অতএব তোমা-দের পিতৃ পুরুষকে যে শয়তান সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, কি করিয়া তোমরা তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে চাও? ধিক্ তোমারে! শয়তান তোমাদের পুরাতন শত্রু। এক মুহূর্ত্তও শয়তান হইতে বেপরওয়া রহিও না। সে তোমাদের আদি

জনক-জননী আদম-হাওয়াকে হত্যা করিয়াছে। সে তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে তোমাকেও হত্যা করিবে। তোমার সাধনাকে অস্ত্র, তওহীদ্‌গকে ধ্যান রূপে পরিণত করিয়া তোমার সেনা বাহিনীতে আল্লাহর সহায়তা প্রার্থনা কর। তোমার এই মারণাস্ত্র এবং সুদৃঢ় বাহিনী শয়তানের উপর দুর্জ্জেয়। কেন তুমি শয়তানের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিতে পার না, যখন খোদা তোমার সাহায্যকারী।

হে আল্লাহর বান্দা! ইহকালের সহিত পরকালের যোগসূত্র স্থাপন কর। পার্থিব ভোগ-লালসা মনে স্থান দিও না। সৃষ্টি কর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্ট বস্তুর উপর নির্ভর করিও না। হে মানব! তোমরা নাফ্‌ছের দাস বনিও না। অথবা হীন প্রবৃত্তি, কিংবা ইহজগৎ বা পরজগতের কামনায় খোদাকে ভুলিও না। তা না হইলে তুমি এমন অমূল্য পদার্থের সন্ধান পাইবে যাহা কখনও ধ্বংস হইবে না। এই অবস্থায় খোদাই তোমাকে সৎপথে পরিচালনা করিবেন। পরে কেহ তোমাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। অতীত পাপের জন্য অনুতাপ কর। আর কদাচ অন্যায় পথে ধাবিত হইও না। সরলতার সহিত অনুতাপ করিলে তবেই ফল পাওয়া যায়। খোদার জন্যই পাপের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কর। লজ্জা করিয়া পাপের উপর আবরণ দিতে যাইও না। সৎকার্য্যের দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিশুদ্ধি সাধন কর। হে খোদার বান্দা! যখন তুমি পীড়িত হও, সেই সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ঔষধের প্রতীক্ষায় থাক, উপযুক্ত ঔষধ পাইলে খোদার নাম লইয়া তাহা গ্রহণ কর। সুস্থ

হইলে খোদাকে ধন্যবাদ দাও। হে ভ্রাতৃগণ! খাদ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ, বিবাহ, ঘরবাড়ী এবং ধন সম্পত্তির কামনায় নাফ্ছের বশীভূত হইও না। তোমার অন্তর্নিহিত সুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া খোদার পথে আত্ম-নিয়োগ কর। পার্থিব কামনা তোমার ইহ জগতে নানাবিধ বিপত্তির কারণ, সুতরাং খোদার দিকে ইহা রুজু কর। পরজগতের পথে মহাযাত্রার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। অস্থায়ী দুনিয়া চিরদিন তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, এই পৃথিবীর মায়া তুমি যত পরিত্যাগ করিতে পারিবে, আখেরাতে তত অধিক তুমি পুরস্কৃত হইবে। জীবন অনিত্য, মনে কর আজই তোমার জীবনের শেষ দিন। সুতরাং এই মুহূর্ত্তে তোমাকে জীবনের পরপারের পথে যাত্রা শুরু করিতে হইবে। অতএব মালাকুল মওতের সহিত তোমার সাক্ষাৎ মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে অদ্যই প্রস্তুত হইতে হইবে।

ওলীদের পক্ষে ইহজগৎ বন্ধন শালা এবং পরজগৎ তাঁহাদের শিল্পাগার। খোদার দিকে তাঁহাদের আকর্ষণ যত বর্দ্ধিত হয়, ততই পৃথিবী ও তাঁহাদের মধ্যস্থলে একটী আবরণের সৃষ্টি হয়। তখন তাঁহারা দুনিয়ার কোন ধার ধারেন না।

তুমি মিথ্যাচারী, সুসময়ে তুমি খোদাকে ভালবাস কোন বিপদ আসিলে অমনি তুমি শিকায়েত্ শুরু কর। পরীক্ষা দ্বারা ভাল মন্দের বিচার হইয়া থাকে। বিপদের সময়ে ধীর, স্থির, ও কর্ত্তব্যে যাহারা অটল, তাহারাই প্রকৃত খোদা-প্রেমিক। এক ব্যক্তি হজরত রসুলোল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া কহিল, "হজরত! আমি আপনাকে ভালবাসি।" হজরত

কহিলেন, "তবে দরিদ্রতা বরণ করিতে প্রস্তুত থাক।" অন্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া কহিল, "হজরত! আমি আল্লাহকে ভালবাসি।" হজরত উত্তর করিলেন "তাহা হইলে বিপদ সহ্য করিবার মত ধৈর্য্য ধারণ কর।" ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদা ও রসুলের যাহারা প্রকৃত প্রেমিক, তাহাদেরই উপর বিপদাপদ আসিয়া থাকে, ইহা খোদার মহা পরীক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য অভাব অনটনে ধৈর্য্যশীল এবং বিপদে অটল থাকিবে।

"রাব্বানা আ'তেনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাঁও অফিল্ আখে-রাতে হাছানাতাঁও অকেনা আজাবান্নার।"

হজরত বড় পীর সাহেবের বক্তৃতা প্রায় একই ধরণের ছিল, কিন্তু একই কথা বার বার শুনিলেও লোকে কোনদিন বিরক্ত হইত না। বরং নূতনভাবে অতি আগ্রহের সহিত উহা শুনিত, তাঁহার বক্তৃতার মাহাত্ম্যে কত বেদিন সৎপথে আসিয়াছে, কত পাপী পাপ পথ ত্যাগ করিয়াছে, কত সংসারী সাধক হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বড় পীর সাহেবের সংসার-জীবন

সংসারের কর্ম্ম কোলাহল এবং পারিবারিক বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া যাঁহারা শরিয়ত, মারেফাত অথবা হকিকত রাজ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত সাধক। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্জ্জন পাহাড় জঙ্গলে তপোবন রচনা করিয়া তথায় কৃচ্ছ সাধনের কোন সার্থকতা নাই, তাই বিশ্বনবী হজরত রসুলে করিম (সঃ) আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট হইয়াও ঘোর সাংসারিক জীবন যাপন করিয়াছেন। পুরুষ হিসাবে সংসারের দায়িত্ব যতখানি থাকা প্রয়োজন, হজরত রসুলে করিম (সঃ) পূর্ণ মাত্রায় তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীদিগের হক্, সন্তান সন্ততির হক্, পাড়া প্রতিবেশীর হক্ পালনে তাঁহার কণামাত্র ত্রুটী কোন দিন পরিলক্ষিত হয় নাই। মানবতার এইরূপ পূর্ণ-বিকাশ সত্যই অভূতপূর্ব্ব।

গওসল আজম্ হজরত বড় পীর সাহেব হজরত রসুলে করিমের (সঃ) আদর্শ প্রতি পালনের জন্য ৫২১ হিজরীতে ৫১ বৎসর বয়সে বাগ্‌দাদের কোন শ্রেষ্ঠকূলে বিবাহ করেন। হজরত রসুলোল্লাহের সুন্নত পালনের জন্য তিনি চারিজন ভাগ্যবতী মহিলার পানি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইহাদের গর্ভে সর্ব্বসুদ্ধ ৪৯টী সন্তান-সন্ততি জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ২৭টী

পুত্র সন্তান এবং ২২টী কন্যা হইয়াছিল। পুত্রগণের মধ্যে অধিকাংশ নানাবিদ্যায় পারদর্শি হইয়া দেশ বিদেশে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কন্যাদের ভিতরও কেহ কেহ এল্‌মে তাছাওফে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

হজরত বড় পীর সাহেব সংসারের দায়িত্ব পালন এবং পরিবারবর্গের সহিত মেলামিশা সম্পর্কে একটী সুনির্দ্দিষ্ট "রুটীন্" বা সময় তালিকা অনুসরণ করিয়া চলিতেন। জীবনে এক দিনের জন্যও তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। সাংসারিক জীবনে তিনি একজন আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ পিতা ছিলেন। তিনি যথারীতি বিবিদের সহিত হাস্যালাপ করিতেন, ছেলে-মেয়েদের লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন, নিজে বাজারে যাইয়া পরিবারবর্গের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সারা দিন তাঁহার নিকট নানা উদ্দেশ্যে লোক জন আসিত, তিনি তাহাদের প্রয়োজনীয় দাবী মিটাইতেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন অথচ সংসারের দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটী ছিল না।

হজরত বড় পীর সাহেব বৎসরের অধিকাংশ সময় রোজা রাখিতেন এবং সন্ধ্যা কালে এফ্‌তারের পর মাত্র দুই খানি রুটী ভক্ষণ করিতেন। হজরতের চার বিবির মধ্যে আশ্চর্য্য সদ্ভাব এবং আন্তরিত মহব্বত ছিল, একে অপরের উপর হিংসা করিতেন না, "সতীনের আড়ি" বলিয়া কোন জিনিষ তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই। কোন একজন বিবি পীড়িতা হইলে অপরে প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। হজরত বড়

পীর সাহেব বিবিদের কার্য্য লাঘবের জন্য অধিকাংশ সময়ে স্বহস্তে ঘর ঝাড়ু দিতেন, পানি তুলিয়া আনিতেন, এবং রুটী পাকাইতেন। হজরত বড় পীর সাহেব যে সময় টুকু সাংসারিক কার্য্যে এবং পরিবারবর্গের সহিত লিপ্ত থাকিতেন, সে সময় টুকুও তিনি খোদার চিন্তা হইতে দূরে থাকিতেন না। সর্ব্বদা তাহার অন্তর খোদার দিকে রুজু থাকিত। কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি তাহা হাতে লইয়া কহিতেন, "ইহা মৃত পদার্থ।" তাহার এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মৃত পদার্থ বিবেচিত হইলে এই দিকে সর্ব্বদা মন আকৃষ্ট থাকিবে না। হুজুরের কোন সন্তানাদির মৃত্যু হইলেও তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম তালিকার কোন ব্যতিক্রম ঘটিত না। তিনি যথারীতি নিজের বাঁধাধরা নিয়ম অনুসারে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেন। তা-ছাড়া মৃতের গোসল দেওয়া, দাফন্ কাফন্ ইত্যাদি অবিচলিত ভাবে নিজেই করিতেন। মৃতের জন্য শোক প্রকাশ, অশ্রু বর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য হইতে তিনি দূরে থাকিতেন।

বড় পীর সাহেবের কতিপয় সুযোগ্য পুত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(১) **হজরত শেখ আব্দুল ওহাব**—ইনি ৫২২ হিজরীতে বাগদাদ শরীফে জন্মগ্রহন করেন। পিতার নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইনি কোরআন, হাদিস, ফেকাহ শাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাসাওফ্ শাস্ত্রেও ইহার জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির অন্ত ছিল না। বিদ্যার্জ্জনের জন্য ইনি মুসলিম জগতের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে যাইয়া বহু কৃতবিদ্ পণ্ডিতের নিকট দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। ৫৪৩ হিজরীতে বড় পীর সাহেব তাঁহার উপর মাদ্রাসার পরিচালন এবং ছাত্র-দিগের শিক্ষাদানের দায়িত্বভার প্রদান করেন। ইহার সুনিপুন অধ্যাপনার সুখ্যাতি শুনিয়া দেশ-বিদেশ হইতে দলে দলে শিক্ষার্থী আসিয়া বাগদাদ শরিফে সমবেত হইত। মোটকথা বাগদাদস্থিত বড় পীর সাহেবের মাদ্রাসাটি তৎকালীন মুসলিম জাহানের বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত হইয়াছিল। বড় পীর সাহেবের এন্তেকালের পর ইনিই 'মোহামেডান ল' বা ইসলামী শরিয়তের বিধানসমুহের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। দেশদেশান্তর হইতে দলে দলে লোক তাঁহার নিকট ফতোয়া গ্রহণ এবং জটিল মস্‌লা সমূহের মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইতেন। খলিফা নাসিরুদ্দীন ইহাকে দুঃস্থ ও নিপীড়িত সমাজের দুর্দ্দশা মোচনের

উপায় নির্দ্ধারণের জন্য মুখপাত্র নিযুক্ত করেন। ইনি কোমল স্বভাব, দানশীল এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ৫৯৩ হিজরীতে এই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা পরলোক গমন করেন। বাগদাদের সুপ্রসিদ্ধ "মহাল্লা হাল্‌বাহ" নামক গোরস্থানে ইহার নশ্বর দেহ সমাহিত রহিয়াছে।

(২) **হজরত শেখ ইসা**—ইনিও পিতার নিকট হইতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি লোকদিগকে হাদিস শিক্ষা দিতেন। 'মোহামেডান ল' সম্পর্কে ইনি গভীর পারদর্শিতার পরিচয় দেন, কবিতা রচনায় ইহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর ইনি দামস্কে চলিয়া যান। অতঃপর তথা হইতে মিসরে যাইয়া স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এখানেও তিনি লোকদিগকে হাদিস শিক্ষা এবং সদুপদেশ দান করিতে থাকেন। ইহার নির্ম্মল চরিত্র এবং গভীর বিদ্যাবত্তায় মিসরবাসী সকলেই ইহাকে অশেষ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। ইনি সুফীবাদ সম্বন্ধে বহু কেতাব লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে "জাওয়াহেরল আসার" সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ৫৭৩ হিজরীতে ইনি মিসরে পরলোক গমন করেন।

(৩) **হজরত শেখ আবদুর রাজ্জাক্‌**—৫২৮ হিজরীতে ইহার জন্ম হয়। পিতার নিকট হইতে ইনি হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করেন। হাদিসে ইনি এত দূর কৃতিত্ব লাভ করেন যে, তাঁহাকে তৎকালে হাদিস শাস্ত্রে প্রামাণ্য ব্যক্তি বলিয়া ধরা হইত। ইনি "হাফেজে হাদিস" নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি একটু নির্জ্জনতা পছন্দ

করিতেন। তাই প্রয়োজন না হইলে তিনি হোজরা হইতে বাহির হইতেন না। ৬০৩ হিজরীতে ইঁহার পবিত্র আত্মা অবিনশ্বর ধামে প্রস্থান করে। ইঁহার জানাজায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রতি শুক্রবারে এবং ঈদের দিন তাঁহার মা্জারের নিকট এখনও অসংখ্য লোক সমাগম হইয়া থাকে।

(৪) **হজরত শেখ মুছা**—৫৩৫ হিজরীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রে ইনি তাঁহার সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি পিতার নিকট হইতে ফেকাহ এবং আবুসঈদ বিন নামার নিকট হইতে হাদিস শিক্ষা করেন। উপযুক্ত শিক্ষকের সান্নিধ্যে থাকিয়া ইনি যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা লোকদের বিশেষ সুফল প্রদান করিয়াছিল, ইনি দামেস্কে বসতী স্থাপন করিয়া তথায় মৃত্যুমুখে প্রাপ্ত হন। তথায় তাঁহার সমাধি রহিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধন্য বাগ্‌দাদ

পারস্যের জিলান-বাগে যে পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহার সৌরভে মাতোয়ারা করিল সর্ব্বপ্রথম বাগদাদের পুণ্যভূমি। যে মণি-রত্ন পারস্যের ভূমি প্রসব করিয়াছিল, তাহার চাকচিক্যে ঝলমল করিয়া উঠিল বাগদাদের আকাশ বাতাস। আজমের আকাশে যে নবচন্দ্র উদিত হইয়াছিল, তাহার সুবিমল কিরণে উদ্ভাসিত করিল আরবের মরু-কান্তার। পাঠ্য-জীবন শেষ হইবার পর হজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) স্বদেশে ফিরিবেন, মানুষ হইয়া দেশের সুসন্তান দেশে ফিরিবেন, কিন্তু তাহা হইল না, বাগদাদবাসী এই স্বর্গীয় রত্নটিকে বিদায় দিবার কথা মনে তুলিয়াই অশ্রুকূলে ভাসিতে লাগিল। তাহারা কিছুতেই তাঁহাকে হাতছাড়া করিতে রাজী হইল না। হজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী চিন্তা করিতে লাগিলেন, দেশে তাঁহার বন্ধন কতটুকু, মাতা ছিলেন তিনিও বহুদিন পূর্ব্বে জান্নাত-বাসিনী হইয়াছেন। সুতরাং জন্মভূমির মায়াটুকু ব্যতীত সেখানে অতি আপন জন কে আছে? এদিকে বাগদাদে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মাদ্রাসাটি, অসংখ্য-ভক্ত অনুরক্তের সাহচর্য্য তাঁহাকে অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট করিতে লাগিল। সুতরাং

নানাদিক বিবেচনা করিয়া তিনি বাগদাদের মাটিতেই শেষ জীবনটুকুর জন্য নীড় রচনা করিবেন বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। বড় পীর সাহেবের এই শেষ সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বাগদাদবাসীদের প্রাণ আনন্দে দুলিয়া উঠিল।

৫২১ হিজরীতে হজরত বড় পীর সাহেব বাগদাদ শরিফে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মান করেন, ঐ সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কর্ম্ম জীবনের শুভ সূত্রপাত আরম্ভ হয়। অতঃপর একটি সুনিয়ন্ত্রিত সময়-সূচীর অনুসরণ করিয়া তিনি মানব সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

বড় পীর সাহেবের দৈনিক কার্য্য তালিকা

হজরত বড় পীর সাহেব সময়ের মূল্য বুঝিতেন, তাই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য তালিকার নিয়ম ও নীতি ভঙ্গ করিয়া তিনি মুহূর্ত্ত-সময় এদিক ও-দিক ব্যয় করিতেন না। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য সূচী সম্পর্কে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে কিছু বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু উহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তিনি ধর্ম্মসেবা, জন সেবা এবং মুরিদ-মোতাকেদ্ ও ভক্ত অনুরক্তদিগকে শিক্ষাদান কখন কোন্ সময়ে এবং কি ভাবে করিতেন এই অধ্যায়ে পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইবেন।

সপ্তাহে তিন দিন হজরত বড় পীর সাহেব বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। প্রত্যেক দিন সকালে এবং

বৈকালে তিনি শিষ্যদিগকে হাদিস, তফ্‌সির, ফেকাহ এবং ওসুল শিক্ষা দিতেন, জোহরের নামাজের পর হইতে আসর পর্য্যন্ত লোকদিগকে কোরআনের ব্যাখ্যা শ্রবণ করান এবং বিভিন্ন মুসলিম-জগৎ হইতে প্রেরিত ফতওয়ার উত্তর প্রদান ইত্যাদিতে কাটিত। মগরিবের নামাজের কিছু পূর্ব্বে এক ব্যক্তি চার পাঁচ খণ্ড রুটি আনয়ন করিত, উহা হজরত বড় পীর সাহেবের নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত হইত। বড় পীর সাহেব নিজের মোবারক হস্তদ্বারা রুটিগুলিকে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতেন। নিজে উহার দ্বারা এফ্‌তার করিতেন এবং উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিতেন।

মগরিবের নামাজ অন্তে হজরত বড় পীর সাহেব আহারের জন্য বসিতেন। এই সময়ে মোজাফফর নামক তাঁহার এক খাদেম উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিত—"যাহাদের আহারের প্রয়োজন আছে, তাঁহারা আসুন।" তদনুসারে বহুলোক হজরত বড় পীর সাহেবের সহিত একই আসনে আহারের জন্য বসিয়া যাইত। ঈশার নামাজের পর বড় পীর সাহেব একাকী তাঁহার হুজ্‌রা শরীফে প্রবেশ করিতেন। অতঃপর নফল নামাজ ইত্যাদি সমাপন করিয়া তিনি খোদার ধ্যানে মোরাকেবায় বসিতেন। এই ভাবে রজনীর এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইত। এই সময়ে বড় পীর সাহেবকে কখনও খুব স্থূল এবং কখনও খুব ক্ষীণাকারে দেখা যাইত।

প্রত্যক্ষদর্শিরা বর্ণনা করিয়াছেন, এই অবস্থায় তিনি মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়াইয়া

রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত কোরআন তেলাওত করিতেন, কোরআন তেলাওয়াত সমাপন হইলে হজরত্ বড় পীর সাহেব সিজ্দায় যাইতেন, এবং কিছুক্ষণ পর মাথা তুলিয়া বসিতেন। অতঃপর দুই হাত তুলিয়া এমন করুণ স্বরে এবং অতি হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় দীর্ঘ মোনাজাত করিতেন, যাহা শুনিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও এক স্বর্গীয় আবেগে ভরিয়া উঠিত। এই সময়ের এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষদর্শিদের বর্ণনায় জানিতে পারা গিয়াছে, তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন হজরত বড় পীর সাহেব মোনাজাতে থাকা কালে এক নূরাণী 'কান্দিল' আকাশ ভেদ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিত, ইহার বিমল জ্যোতিতে তিনি সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইতেন। সেই স্বর্গীয় আলোক-ঝর্ণার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে "আস্সালামো আলায়কুম" এবং ইহার প্রত্যুত্তর "আলায়কুমস্সালাম" শব্দ শ্রুতিগোচর হইত, রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত এই অবস্থায় কাটিত।

তাসাওফের সাধারণ নীতি এই যে, কাহারো বেলায়েতের শেষস্তর "ফানাফিল্লাহ" হাসেল হইলে তাঁহার আর নফ্ল এবাদত বা রেয়াজাত করার আবশ্যকতা থাকে না, কারণ এই সময়ে শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে খোদা ব্যতীত তাঁহাদের আর দ্বিতীয় ধ্যান বা লক্ষ্য নাই। এই শ্রেণীর সুফীগণ সাগরের কল্লোলে, বাতাসের প্রবাহে, পাখীর কুজনে, বৃক্ষ-লতার হিল্লোলে এমন কি প্রতি মরু-কণার মধ্যে প্রতিনিয়ত "আল্লাহ" "আল্লাহ" রব শুনিতে পান। তাঁহাদের প্রতিলোম কূপ হইতেও "আল্লাহ"

"আল্লাহ" শব্দ জারী হইতে থাকে। বড় পীর সাহেব এই অবস্থার বহু উর্দ্ধ দেশ অতিক্রম করিলেও তিনি নফল এবাদত এবং কঠোর সাধনা পরিত্যাগ করেন নাই, নিজের জন্য ইহার প্রয়োজন না থাকিলেও মুরিদগণের পারত্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ইহা করিতেন। হজরত বড় পীর সাহেব প্রায়ই বলিতেন, আকাশ যেমন সমস্ত চরাচরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ আমার হস্ত সমস্ত মুরিদের মস্তকোপরি স্থাপিত।

হজরত বড় পীর সাহেবের দরবারে অতি সাধারণ লোক হইতে আরম্ভ করিয়া গওস, কুতব, ওলী, আব্দাল শ্রেণীর কত সাধু-মহাপুরুষের সমাবেশ হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই হজরতের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের মানসে তাঁহার পাদমূলে সমবেত হইতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অদ্বিতীয় মহা পণ্ডিত, কেহ কেহ জগদ্বিখ্যাত আলেম এবং কেহ কেহ খ্যাতনামা সুফী ও পীররূপে সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শেখ আবুল হাসান নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন, "আমি বড় পীর সাহেবের নিকট মাত্র এক বৎসরে যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, অন্যের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিতে হইলে আমার পক্ষে অন্যূন কুড়ি বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইত।" এখানে একটী বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন নহে যে, যিনি বড় পীর সাহেবের দরবারে আসিতেন, তিনি যত বড় হউন না কেন, নিজকে এই মহাপুরুষের পায়ে সম্পূর্ণ 'ফানাহ' করিয়া দিতেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সুফী এবং আলেম শেখ আলি বিন্ হিতি, শেখ বাকা বিন বাতু প্রভৃতি স্বহস্তে বড় পীর সাহেবের মাদ্রাসা

ঝাড়ু দিতেন। কোন কোন সময়ে ভিশ্‌তির কার্য্য করিতেন। শেখ আলি বিন হিতি ইরাকের কারামত্‌-সম্পন্ন ওলী ছিলেন, তাঁহার দোওয়ায় মৃত জীবিত হইয়াছে।

শেখ বাকা বিন বাতু "আওতাদ" শ্রেণীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কারামত্‌ সম্পর্কে একটী কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

এক সময় তিন জন ফকিহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ইহার এমামতে নামাজ পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার কোরআন পাঠ শুনিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, এমন কি ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে ফকিহত্রয় তথায় অবস্থান করিলেন। শেষ রাত্রিতে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী এক ঝর্ণায় অজু করিতে গেলে এক বিরাট আকার ব্যাঘ্র তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই অতর্কিত বিপদে ফকিহরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শেখ বাকা বিন বাতু হুজ্‌রা শরিফে মোরাকাবায়ে ছিলেন। তিনি ফকিহদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া হুজ্‌রা হইতে বাহির হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট গমন করিতেই ব্যাঘ্রটী তাঁহার পায়ের উপর পড়িল এবং পোষা বিড়ালের ন্যায় তাঁহার পা চাটিতে লাগিল। মহামান্য শেখ তখন ব্যাঘ্রটীর গাত্রে মৃদু আঘাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন —"পাজী! তুই আমার মাননীয় অতিথিদিগকে অপমান করিতেছিস্!" অতঃপর ব্যাঘ্রটী তাঁহাকে সালাম করিয়া ধীরে ধীরে বনের দিকে প্রস্থান করিল। ইহা দেখিয়া ফকিহত্রয় তাঁহাদের ভুল ধারনার জন্য শেখ বাকা বিন বাতুর নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব ভুলিয়া গিয়া শেখ বাকার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

শেখ শাহাবুদ্দিন বিন্ ওমর সাহরাওয়ার্দ্দী যৌবনে অতিশয় গ্রন্থ-প্রিয় ছিলেন। তিনি মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। সর্ব্বক্ষণ তিনি একরাশ গ্রন্থের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার চাচা ছিলেন একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এবং বড় পীর সাহেবের পরম ভক্ত। তাঁহার ইচ্ছা যে ভ্রাতুষ্পুত্র ধর্ম্ম শাস্ত্রের দিকে রত হইয়া তাহার গবেষণা করুক। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র তাহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। অবশেষে একদিন তিনি তাঁহাকে লইয়া বড় পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন। হুজুর তখন যুবক সাহরাওয়ার্দ্দীর বুকে হাত রাখিলেন। ইহাতে তিনি দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে সকল বিষয় ভুলিয়া গেলেন। অধিকন্তু তাঁহার মন খোদার দিকে সম্পূর্ণ রুজু হইল। ইনি কালে ধর্ম্ম ও ন্যায় শাস্ত্রে বিচক্ষণ মহা পণ্ডিতরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হজরত বড় পীর সাহেবের গুণে লোহাও সোনা হইয়া গিয়াছে।

ফতওয়া দানে হজরত বড় পীর সাহেবের অসামান্য প্রতিভা

জ্বলন্ত অঙ্গার কাপড়ে চাপা দিয়া কতক্ষণ গোপন রাখা যাইতে পারে? হজরত বড় পীর সাহেব প্রথমতঃ নিজকে যতই গোপন রাখিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, ততই দুর্ভেদ্য অন্তরাল

হইতে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা—অসাধারণ গুণরাজি আপনিই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার সুযশ সুখ্যাতির সৌরভ মক্কা, মদিনা, এরাক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিসর, এয়মন হইতে আরম্ভ করিয়া কাবুল, কান্দাহার, পারস্য পর্য্যন্ত বিমোহিত করিয়া তুলিল, এই মহাপুরুষের দর্শন লাভের জন্য দেশ দেশান্তর হইতে অযুত মুসলমান পতঙ্গপালের ন্যয়ে পুণ্যভূমি বাগ্দাদের দিকে ছুটিতে লাগিল। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, সেইরূপ বিশ্ব-মুসলমানের প্রাণকে বাগদাদ নগরী আকর্ষণ করিতে লাগিল। অর্থের মমতা, জায়া-পুত্রের মায়া, দুর্গম পথের দূরত্ব কোন কিছুই তাহাদিগকে পশ্চাতের দিকে টানিয়া রাখিতে সমর্থ হইত না।

এই সময় হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট প্রত্যহ অসংখ্য ফতওয়া প্রার্থীগণ আসিয়া সমবেত হইতেছিল। জটিল মস্লা গুলির সমাধান যখন কোথাও কাহারও দ্বারা সম্ভব না হইত, তখনই তাহা লইয়া লোকে বড় পীর সাহেবের দরবারে ছুটিত, হজরত বড় পীর সাহেব জোহরের নামাজ পড়িয়া ফতওয়া দিতে বসিতেন। ফতওয়া দানে তাঁহার এমন একটী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি একটী বার মাত্র উহা শুনিয়া কিংবা লিখিত প্রশ্ন পড়িয়া তখনই ফতওয়া লিখিয়া দিতেন। এক বিন্দু চিন্তা করিবার কিম্বা কোন কেতাব দেখিবার প্রয়োজন হইত না। যেন তিনি নিজেই একখানি বিরাট "ইন্সাইক্লোপিডিয়া" বা বিশ্ব-কোষ। আরব বা আজমের কোনও শক্তিশালী আলেম যে ফতওয়ার সমাধান বা মীমাংসা করিতে

পারেন নাই। বড় বড় তেজস্বী মস্তিষ্ক যাহা লইয়া দীর্ঘ কস্রত করা সত্বেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই, বড় পীর সাহেবের নিকট তাহা পানির ন্যায় তরল মনে হইত। তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না করিয়া যাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন, অন্যের দ্বারা যুগ-যুগান্তর গবেষণা করিয়াও তাহা সম্ভব হইত না। তিনি বলিতেন, কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই ঐশ-প্রেরণা তাঁহার মনের কূলে দোলা দিয়া যায়। ইহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন।

হজরত বড় পীর সাহেব জীবনে কত লক্ষ লক্ষ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, কত লোককে শরিয়তের বিধান মতে শাস্তি ও বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন দিন একটীও উত্তরে তাঁহার ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি যাহা মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহা সবই অভ্রান্ত এবং চরম। তাঁহার সেই মীমাংসার উপর কাহারও "চুঁ" ও "চেরা" (কেন ও কিজন্য) করিবার শক্তি ও সাহস হয় নাই। হজরত বড় পীর সাহেবের উপস্থিত জওয়াব্ সম্পর্কে এখানে সামান্য একটী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে।

এরাকবাসী এক ব্যক্তি শপথ করিলেন যে, হজরত শেখ বায়াজিদ বোস্তামীর অপেক্ষা যদি তিনি গুণে শ্রেষ্ঠ না হন, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হইবে। লোকটী ছিলেন একজন মস্তবড় ফকীহ্। তিনি নিজেই এসম্বন্ধে বহু কেতাব ঘাঁটাঘাটি করিয়াও কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারিলেন না।

এমন কি এরাকের ওলামা সম্প্রদায় দীর্ঘ আলোচনা ও গবেষণা করিয়াও কোন কূল-কেনারা পাইলেন না। হজরত বায়াজিদ বোস্তামির চেয়ে তিনি গুণে শ্রেষ্ঠ কি না, এই জটিল সমস্যার মীমাংসা কাহারও দ্বারা আদৌ সম্ভব হইল না। অবশেষে তিনি হজরত বড় পীরের শরণাপন্ন হইলেন। আদ্যান্ত বিবরণ শুনিয়া হজরত বড় পীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য তুমি এইরূপ অদ্ভুত শপথ করিয়াছিলে? লোকটী উত্তর করিলেন, একটা আকস্মিক খেয়াল এবং উত্তেজনার বশে আমি এইরূপ অন্যায় শপথ করিয়াছি। যাহা হউক, সামান্য চিন্তা না করিয়া বড় পীর সাহেব এই সমস্যার চরম মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, প্রশ্নকারীর স্ত্রী তালাক হইতে পারে না, কারণ তিনি কতিপয় বিষয়ে হজরত বায়াজিদ বোস্তামী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হজরত বোস্তামী সাধক ছিলেন কিন্তু ফকিহ্ ছিলেন না, আর এই ব্যক্তি একাধারে ফকিহ্ ও সাধক, হজরত বোস্তামীর স্ত্রী কিম্বা পুত্র কন্যা ছিল না, এ ব্যক্তির তাহা রহিয়াছে। কি অপূর্ব্ব জ্ঞানের গভীরতা! ঐশশক্তি সমন্বয় না হইলে ইহা কি কখন সম্ভব?

বড় পীর সাহেবের কোপে শয়তান দগ্ধীভূত হইবার কথা

পীরাণে পীর গওসল আজম বলিয়াছেন, পাঠ্য জীবনে আমি বাগদাদ নগরীর উপকণ্ঠস্থ এক জনমানবহীন বিরাণা স্থানে রাত্রিতে অবস্থান করিতাম, এই সময়ে শয়তান নানাপ্রকার বিভীষিকাময় আকৃতি ধারণ করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিত, আমাকে সারারাত বিভিন্ন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত শয়তান বাহিনীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইত। তাহারা আমার দিকে সতীক্ষ্ণ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিত, আমি নির্ভীকভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের সকল প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ প্রতিহত করিতাম। এই সময়ে আমার অভ্যন্তর হইতে কে যেন শব্দ করিয়া বলিতেন—"হে আবদুল কাদের! তুমি নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদের দিকে ধাবিত হও।" আমি উন্নত মস্তকে তাহাদের দিকে ধাবিত হইতেই উহারা চীৎকার করিতে করিতে দুই পার্শ্বে পলায়ন করিত। এই শয়তানদলের মধ্যে একটী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিত, তুমি এই স্থান হইতে চলিয়া যাও, নচেৎ মারা পড়িবে। ইহা শুনিয়া আমি তাহার গণ্ডে প্রচণ্ডভাবে এক চপেটাঘাত করিতেই সে বিকট শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়া পালাইত। আর একজন শয়তান সাহসভরে আমার দিকে অগ্রসর হইতেই আমি "লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা

বিল্লাহেল আলিয়েল আজিম” পড়িতাম, ইহাতে সে দগ্ধীভূত হইয়া যাইত। এক সময় দুর্গন্ধময় কদাকার একটী লোক আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “আমি ইব্‌লিস্‌, তোমাকে সেবা করিতে আসিয়াছি, তুমি আমাকে এবং আমার অনুচরদিগকে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ব্বল করিয়াছ।” আমি তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, একখানি সবল অদৃশ্য হস্ত উর্দ্ধ দিক হইতে প্রকাশিত হইয়া তাহার মস্তকে সজোরে প্রহার করিতেছে, ইহাতে মালাউন মাটীর ভিতর প্রোথিত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর শয়তান আবার আমার নিকট উপস্থিত হইল, তাহার হস্তে জ্বলন্ত অগ্নি-শিখা, ইহার দ্বারা সে আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, এমন সময়ে শ্বেত অশ্বারোহী এক বীর সৈনিক তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে একখানি তরবারি প্রদান করিলেন। ইহাতে ইব্‌লিস পিছু হটিয়া গেল।

আর একদিন বড়পীর সাহেব দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি কিছু দূরে বসিয়া নিজের মাথায় ধূলী নিক্ষেপ করতঃ করুণ সুরে ক্রন্দন করিতেছে। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে ? কেনই বা এইভাবে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছ ? সে কহিল—আমি ইবলিস—মানুষ জাতির পরম শত্রু। সৎলোকের অনিষ্ট করাই আমার কার্য্য, কিন্তু এই পর্য্যন্ত আমার যাবতীয় ষড়যন্ত্রজাল আপনার উপর বিস্তার করিয়াও আমি শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছি, এখন আমার পরিণাম ভাবিয়া আমি

ক্রন্দন করিতেছি, বলিতে কি, আপনি যখন আমার প্রতি অভিসম্পাদ প্রেরণ করেন, তখন ইহা আমার পক্ষে লৌহদণ্ডের আঘাত অপেক্ষা ভীষণ কঠোর মনে হয়।

বড় পীর সাহেবের কোন মুরিদ আজাব ভোগ করিবে না

একদা বড় পীর সাহেব কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আমার মুরিদগণের মধ্যে কেহ বিনা তওবায় মৃত্যু মুখে পতিত হইবে না, তিনি আরও বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত অবধি তাঁহার মুরিদ এবং মুরিদগণের এক তালিকা দেখাইয়াছেন। ইহারা বেহেশত যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। বড় পীর সাহেব আরও বলিয়াছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও মুরিদ আমার সহিত বেহেশতে লইয়া যাইতে বাকী থাকিবে, ততক্ষণ আমি বিচারের দিন খোদার দরবার পরিত্যাগ করিব না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "হুজুর! যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে আপনার মুরিদ নহে, অথচ ভক্তিভরে আপনার নাম উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা কিরূপ হইবে? হুজুর উত্তর করিলেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, আমার মাদ্রাসার সম্মুখ দিয়া ঘটনা ক্রমে যে চলিয়া গিয়াছে, খোদা-তায়ালা তাহাকেও শাস্তি দানে বিরত হইবেন।

এক ব্যক্তির ভীষণ কবরের আজাব ও রোদন রহিত হইবার কথা

এক সময়ে কতিপয় লোক হজরত বড় পীর সাহেবকে কহিল হুজুর! 'বাবুল আজাজ' গোরস্তানে এক মৃতের কবর হইতে ভীষণ রোদন, ক্রন্দন এবং গোঁঙানীর শব্দ শ্রুত হইতেছে। হুজুর বলিলেন, ঐ ব্যক্তি জীবদ্দশায় কি কখন আমার খেরকা পরিধান করিয়াছিল? তাহারা উত্তর দিল—"আমরা তাহা বলিতে পারি না।" হুজুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি কোন দিন আমার বক্তৃতা শুনিয়াছিল? তাহারা এবারও পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর করিল। অতঃপর হুজুর জানিতে চাহিলেন, সে আমার এমামতে কি একটী ওয়াক্তও নামাজ পড়ে নাই? দুঃখের বিষয়, তাহারও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। ইহাতে হুজুর কহিলেন, "হতভাগ্য লোকেরাই বিপদ ভোগ করিয়া থাকে।" অতঃপর হুজুর সিজদায় পতিত হইলেন, তাঁহার চেহারা পরিবর্ত্তন হইতে হইতে তিনি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মাথা উত্তোলন করিয়া কহিলেন, লোকটীর ভাগ্য ভাল, সে আমাকে দেখিয়া আমার সম্বন্ধে ভাল ধারনা প্রকাশ করিয়াছে, খোদা তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। অতঃপর ঐ কবর হইতে আর ক্রন্দনের শব্দ শুনা যায় নাই। একবার

হুজুর দোজখের দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার আসহারের মধ্যে কেহ তোমার দোজখে আছে কি না?" তিনি উত্তর করিলেন—"না"। কি সৌভাগ্য হজরত বড় পীর সাহেবের মুরিদগণের!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বড় পীর সাহেবের কারামত্

আল্লাহতায়ালা তাঁহার বিভ্রান্ত বান্দাদিগের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু পায়গম্বর ছুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহর খাস্ অনুগ্রহে ইঁহারা এক অসীম শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন তখনই তাহা হইয়াছে। আবু জেহেলের এতেরাজে শেষ নবীর (সঃ) একবিন্দু অঙ্গুলির ইশারায় চাঁদ ছুই টুকরা হইয়া গিয়াছে, প্রস্তর কঙ্কর, তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছে। পথিপার্শ্বের বৃক্ষলতা নত শিরে তাঁহাকে সালাম জানাইয়াছে, শুষ্ক খেজুর বৃক্ষের মিম্বর তাঁহার বিচ্ছেদ ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া মানবকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়াছে, এই সমস্ত বিশ্ব নবীর (সঃ) জীবনে অতি মামুলী ঘটনা ছিল। নবীদের এই অলৌকিক শক্তির নাম —"মোজেজা"।

হজরত রসুলে আকরম সাল্লাল্লোহো আলায় অসাল্লামের তিরোধানের পরই নবুওয়াতের যুগ শেষ হইয়াছে। ইহার পর আসিয়াছে ওলী-আব্দাল গওস্-কুতবের যুগ। নবুওয়াতের সীমারেখাটুকু মাত্র এই ছুই শ্রেণীর মহাপুরুষদের মধ্যে পার্থক্য। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন প্রদেশে বহু ওলিয়ে কামেল আবির্ভূত

হইয়াছেন; যাঁহারা নানা অলৌকিক ঘটনার দ্বারা মানুষের চিত্তজয় করিয়া গিয়াছেন। ওলী-আল্লাহগণের এই অসাধারণ শক্তিকে ইসলামের পরিভাষায় আমরা "কারামত্" নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

আমরা সাধারণ নীতিতে মানুষের কর্ম্মশক্তিকে সসীম মনে করি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, খোদা যাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়াছেন, তাহার পক্ষে এই সসীমতার গণ্ডি কতক্ষণের জন্য। মানুষ এবাদত, রেয়াজাত বা সাধনার বলে এমন দুর্জ্জয় শক্তি-সম্পদের অধিকারী হইতে পারে—যাহা তাহার পক্ষে স্থল, জল, অন্তরীক্ষ কিম্বা বন-কান্তার, গিরি-পর্ব্বতের দূরত্বকে দূর করিয়া দেয়। বায়বীয় কিম্বা তাড়িৎ শক্তির মত তখন তাহার মনের সঙ্কল্প মুহূর্ত্তে কার্য্যে পরিণত হয়। স্থল ভাগই আমাদের বিচরণ ক্ষেত্রে, কিন্তু বহু ওলী-আল্লাহর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা পানির উপর অবাধে ভ্রমণ করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের পায়ে এক বিন্দুও পানি স্পর্শ করে নাই। তা ছাড়া মৃতকে আল্লাহর অনুগ্রহে জীবিত করা, দুরারোগ্য ব্যাধি দূর, সন্তানহীনার সন্তান দান প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যাবলী ইঁহারা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে দেখাইয়া গিয়াছেন। একবার একদল লোক হজরত আবু সঈদ নামক প্রখ্যাতনামা পীর সাহেবের খেদমতে আসিয়া কহিল—হুজুর! শুনিয়াছি আপনি পানির উপর হাঁটিতে পারেন, আমরা উহা দেখিতে চাই। পীর সাহেব কহিলেন—পানির উপর হাঁটা এমন বড় কথা কি? ব্যাং ও হাঁসেরা ত' ইহার জন্য যথেষ্ট। তাহারা আবার কহিল—তবে

শূন্যে ভ্রমণ করুন! পীর সাহেব এবারও উত্তর দিলেন—সামান্য কীট পতঙ্গ এবং পক্ষিগণ যাহা করিতে পারে, আশ্‌রাফুল্ মোখ্‌লুকাত্ মানুষের পক্ষে তাহা করা খুব বড় গৌরবের কথা কি হইল? তখন লোকগুলি পুনরায় আরজ পেশ করিল, হুজুর আমরা শুনিয়াছি ওলী-আল্লাহগণ মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে দূর-দূরান্ত পরিভ্রমণ করিতে পারেন। পীর সাহেব উত্তর দিলেন, শয়তান চক্ষের পলকে অস্ত-তোরণ হইতে উদয়-তোরণ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে পারে। সুতরাং ইহাকেও আমি একটা বড় কাজ বলিয়া মনে করিতে পারি না।

সুফীদের ইহাই চিরন্তর নিয়ম যে, তাঁহারা নিতান্ত খোশখেয়াল কিম্বা কাহারও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া "কারামত" দেখাইতে চান না। একেবারে অপরিহার্য্য আবশ্যকতা ব্যতীত তাঁহারা কারামত প্রদর্শন করাইতে নারাজ।

এখানে বলা আবশ্যক যে সুফীবাদের শেষ স্তর "ফানাফিল্লাহ" বা "কুন্ ফায়াকুন"। সাধক যখন এই স্তরে উপনীত হন, তখন লৌকিক শক্তির সকল বাধা কিংবা সংকীর্ণতা তিরোহিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় তিনি মুখ দিয়া যাহা বলিবেন, তদ্দণ্ডে তাহাই হইবে, তখন তাহার আহার-বিহার, নিদ্রা-জাগরণ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ভাব ধারণ করিবে। বনের হিংস্র পশুরাও হিংসা ভুলিয়া গিয়া তাহার পায়ে মাথা নত করিবে।

আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য আবিষ্কার রেডিও, টেলিপ্যাথী, টেলিভিশন, এরোপ্লেন্ এবং এক্স-রে বা

রঞ্জনরশ্মি প্রভৃতি। কিন্তু ওলী-আল্লাহগণের নিকট বিজ্ঞানের এই সব বাহাদূরীর কোনই মূল্য নাই। বিজ্ঞানের এই অবদান মানুষকে যে সব অতিমানবোচিত ক্ষমতায় গৌরবান্বিত করিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যানে ওলী-আল্লাহগণ স্বভাবতঃ এই সব শক্তির অধিকারী ছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, হজরত আবু সঈদ শত শত মাইল দূরে বসিয়া শিষ্যগণ সহ বড় পীর সাহেবের দৈনন্দিন বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। সেখানে কি কোন লাউড্ স্পীকারের ব্যবস্থা ছিল? বহু মাথা ঘামাইয়া—বহু গবেষণা করিয়া বিজ্ঞান 'এক্স-রে' আবিষ্কার করিয়াছে। দেহের মণি-কোঠায় লুক্কায়িত থাকিয়াও রোগের এখন নিস্তার নাই, এক্স-রে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। কিন্তু ওলী-আল্লাহগণের নিকট বিজ্ঞান পরাস্ত। তাঁহারা চোখ বুজিলে অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অণুপরমাণু দর্পনের মত দেখিতে পান। তৃণলতা ও বৃক্ষের প্রাণ আছে, কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও একথা কেহ বিশ্বাস করিত না, কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাহা আমাদিগকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। বলা বাহুল্য এই বৃক্ষতত্ত্ব লইয়া বেশী মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। বৃক্ষের প্রত্যেক পাতাটি যে সজাগ, ইহারা প্রতিনিয়ত "আল্লাহ" "আল্লাহ" জপ করিতেছে, সুফীগণের কর্ণে তাহার ঝঙ্কার বাজিয়া থাকে। আমার মনের নিভৃতে যে উদ্দেশ্য বা চিন্তা-তরঙ্গ রহিয়াছে, টেলিপ্যাথী অবাধে তাহা বলিয়া দিতে পারে। কিন্তু বিনা টেলিপ্যাথীতে ওলী-আল্লাহগণ মানুষের মনের ভাব অতি সহজে গ্রহণ করিতে

পারেন। দুঃখের বিষয় জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ আধ্যাত্মিক শক্তির এই মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা ইহাকে নিছক বিকৃত মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া মনে করেন। এই সম্পর্কে যোগ্য প্রতিবাদের সময় ইহা নহে। এখানে আমরা এইটুকু বলিয়া রাখিতে চাই যে, বিজ্ঞান মানুষের সৃষ্টি আর আধ্যাত্মিকতা খোদার সৃষ্টি, সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য যে কোথায় এবং কত দূর, আশা করি তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না।

বড় পীর সাহেব করামতের সুলতান ছিলেন। তিনি জীবনের প্রতি পদে এমন সব কারামত দেখাইয়া গিয়াছেন, যাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান যাহা কল্পনাও করিতে পারে না, হুজুরের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বোঁস্তার ভূমিকার ভিতর পারস্যের অমর কবি সাদী লিখিয়াছেন—"এক দিন আমি 'রূদবার' নামক প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, এক বিপুলাকায় ব্যাঘ্রের উপর সওয়ার হইয়া একব্যক্তি আমার দিকে আসিতেছেন, ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার পদদ্বয় ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ব্যাঘ্র-সওয়ার নিকটে আসিয়া সহাস্যে কহিলেন—হে সাদী! তুমি আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া নিশ্চয়ই ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ। কিন্তু আমি তোমাকে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে,—

"তূ আজ হুক্মে দাওয়ার মা'পেচ্
না পিচদ জে হুক্মে তু হেচ্।"

অর্থাৎ তুমি যদি খোদাতায়ালার আদেশ পালনে মুখ না ফিরাও, তোমারও আদেশকে অমান্য করিতে কাহারও সাহস হইবে না।" ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, একান্ত ভাবে যাঁহারা খোদার সাধু বান্দা, জগত তাঁহাদের বশীভূত। তাঁহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহারা খোদার ইশারায় আলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। তবে একথা সত্য যে, যুগের মানুষ ওলী-আল্লাহদের কারামত লইয়া অনেক ক্ষেত্রে ছিনিমিনি খেলিয়াছেন। তাঁহাদের সরল ও শুভ্রোজ্জ্বল চরিত্রকে অত্যধিক মাত্রায় রঞ্জিত করিতে যাইয়া নানা আলীক কিংবদন্তীর আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবতার সহিত ইহার মধ্যে অনেকেরই হয়তো সম্পর্ক নাই। ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, এই প্রচেষ্টার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সেই সব মহাপুরুষের আদর্শ-জীবনকে খাটো করা হইয়াছে।

হজরত বড় পীর সাহেবের কারামত বা অলৌকিক কার্য্য কলাপের মধ্যেও যে এই শ্রেণীর অতিরঞ্জিত কেচ্চা-কাহিনী নাই, তাহাও আমরা বলিতেছি না। প্রসিদ্ধ এবং বিশ্বস্ত কেতাব সমূহের সাহায্যে আমরা সে সমস্ত কতকটা বাছাই করিয়া অতি মো'তাবের রওয়ায়েতগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করিব। ইহার ভিতরেও যদি কোন অলীক ও অতিরঞ্জিত কথা থাকিয়া যায়; তাহার জন্য দায়ী এই দীন হীন লেখক নহেন, বরং যে যে কেতাব হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই কেতাবের প্রণেতাগণ।

চন্দ্রমাস মানুষ আকারে বড় পীর সাহেবের দরবারে আগমন

পীর আবুল কাসেম বর্ণনা করিয়াছেন—আমরা কতিপয় ব্যক্তি ৫৬০ হিজ্‌রীর এক জুমআর দিবসের শেষভাগে বড় পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত ছিলাম, ঐ সময়ে জমাদিয়াল আখের মাসের শেষভাগ ছিল, বড় পীর সাহেব আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় একটী পরমাসুন্দর যুবক উপস্থিত হইয়া হুজুরকে সালাম জানাইল এবং কহিল—হে খোদার ওলি! আমি রজব মাস। আর মাত্র কয়েকদিন পরে আমি আসিতেছি। এক্ষণে আমি আপনাকে জানাইতে আসিলাম যে, আমার মধ্যে কি কি ঘটনা সংঘটিত হইবে। হে আল্লার ওলি! জানিয়া রাখুন, এই মাস লোকের পক্ষে মহা কল্যানকর। রজব মাসের শেষভাগে আর একটী অপরিচিত যুবক আসিয়া কহিল—আমি শাবান মাস, এইমাসে কি কি কাণ্ড সংঘটিত হইবে, তাহার সংবাদ আপনাকে দিতে আসিয়াছি। জানিয়া রাখুন, এইমাসে বাগদাদ বিধ্বস্ত হইবে, হেজাজে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে এবং খোরাসানে তরবারী চলিবে। পুনরায় ২৯শে শাবান আর একটী যুবক আসিয়া কহিল, হুজুর আমি রমজান মাস, এইমাসে আপনার উপর কতিপয় বিপদ আপতিত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। ইহাই আপনার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।

এইরূপ প্রত্যেক মাস পূর্ব্ব মাসের শেষভাগে ভালমন্দ সংবাদ লইয়া বড় পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইত। অতঃপর বড় পীর সাহেব উক্ত রমজান মাসে পীড়িত হইয়া পরবর্ত্তী রবিওস সানি মাসে এন্তেকাল করেন।

বড় পীর সাহেবের দোওয়ায় জনৈক বণিকের ধনপ্রাণ রক্ষা

একদা আবুল মোজাফফর বিন হাসান নামক বাগদাদের এক ধনাঢ্য সওদাগার শেখ হাম্মাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, হুজুর! আমরা সিরিয়ায় পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এক কাফেলা প্রস্তুত করিয়াছি, হুজুর আমাদের জন্য একটু দোওয়া করুন, যেন আমরা নিরাপদে দেশে ফিরিতে পারি। পীর হাম্মাদ কহিলেন, বাবা! এই বৎসর তোমরা সিরিয়ায় পণ্য দ্রব্য লইয়া যাইও না, ইহা তোমাদের পক্ষে কল্যানজনক হইবে না, যদি যাও, তাহা হইলে তুমি নিহত এবং মালপত্র লুণ্ঠিত হইবে। বণিক ইহা শুনিয়া নিরাশ মনে বাড়ী ফিরিতেছিল, পথিমধ্যে বড় পীর সাহেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বড় পীর সাহেব বণিকের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন—"তুমি যাহা সংকল্প করিয়াছ, তাহা পূর্ণ কর, তুমি নিরাপদে বাণিজ্য-সম্ভারসহ দেশে ফিরিবে।" তদনুসারে বণিক তাহার বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাত্রা করিল এবং কিছুদিন পর বিপুল সাফল্যের সহিত দেশে ফিরিতে ছিল।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে একদিন উক্ত বণিক হালবের এক শহরে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার একটী তোড়া লইয়া ভ্রমণ করিতেছিল। হঠাৎ তাহার মলত্যাগের প্রয়োজন হওয়ায় সে এক জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। বণিক মুদ্রার তোড়াটী এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া মলত্যাগ করিতে গেল। মলত্যাগ সমাপন করিয়া ফিরিবার সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে টাকার কথা তাহার আদৌ মনে পড়িল না। তাঁবুতে আসিয়া রাত্রিতে সে শুইয়াছে, এমন সময়ে নিদ্রাযোগে সে স্বপ্ন দেখিতেছে, একদল আরব-দস্যু যেন তাহার কাফেলার উপর আপতিত হইল এবং তাহার দলের লোকদিগকে হত্যা করিয়া যাবতীয় মালপত্র কাড়িয়া লইয়া গেল। সে আরও দেখিল, একটী দস্যু তাহার গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া তাহাকেও হত্যা করিল। ইহাতে বণিক ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতেই তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিতে পাইল, সত্যই তাহার গলদেশে কাটার চিহ্ন এবং তাহা হইতে ঝর্‌ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। এই সময়ে হঠাৎ সেই স্বর্ণ মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটীর কথা তাহার মনে উদয় হইল, সে তদ্দণ্ডে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উহা পাইল। অতঃপর বণিক বাগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মনে করিল, প্রথমে তাহার শেখ হাম্মাদের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত, কারণ তিনিই বর্ত্তমানে বাগদাদের প্রবীন পীর। আবার তাহার মনে উঠিল, বড় পীর সাহেবের সহিত প্রথমেই দেখা করা কর্ত্তব্য। কারণ তিনিই তাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন, যাহা হউক, দোটানার মধ্যে পড়িয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করা বণিকের ভাগ্যে আর

ঘটিয়া উঠিল না। একদিন দৈবক্রমে স্থানীয় সুলতানী বাজারে শেখ হাম্মাদের সহিত বণিকের সাক্ষাৎ হইলে মহামান্য শেখ তাহাকে কহিলেন—হে আবুল মোজাফফর! তুমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। বড় পীর সাহেব তোমাকে দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, নচেৎ তুমি ধন-প্রাণ সবই হারাইতে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তুমি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে না। তিনি খোদার কাছে তোমার জন্য ৭০ বার প্রার্থনা করিয়াছেন, তাই তোমার উপর নির্দ্দিষ্ট বিপদ বাস্তব আকার হইতে খোদা স্বপ্নে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন।

শূন্যে কার্পেট বিছাইয়া সদলবলে নামাজ পাঠ

সোহায়েল বিন্ আবদুল্লাহ তশতরী বলিয়াছেন—একদিন হঠাৎ বড় পীর সাহেব আমাদের চক্ষের অন্তরালে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য দলে দলে লোক চতুর্দ্দিকে ছুটিল। আমিও তাইগ্রীস নদীর উপকূলে তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। বহু অনুসন্ধানের পর আমরা হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বড় পীর সাহেব পানির উপর দিয়া নদী পার হইয়া আসিতেছেন। আমরা আরও দেখিলাম, পানির উপর মাথা তুলিয়া অসংখ্য মৎস্য এবং অন্যান্য জলচর প্রাণী তাঁহার পদদ্বয়ে চুম্বন করিতেছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিছুক্ষণ পর জোহ্‌রের নামাজের সময় হইল,

আমরা দেখিতে পাইলাম আকাশের এক কোণ হইতে একটী বিরাট গালিচা উড়িয়া আসিল এবং আমাদের অদূরে উহা শূন্যের উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইল। গালিচাটী এত সুন্দর এবং মূল্যবান যে, চোখ সহজেই উহার দিক হইতে ফিরিতে চাহে না। অতঃপর গম্ভীর প্রকৃতির দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া উহার উপর নামাজে খাড়া হইলেন, এবং বড় পীর সাহেবের এমামতে নামাজ শুরু হইল, আমরা লক্ষ্য করিতেছিলাম, যখন বড় পীর সাহেব নামাজে "সামিআল্লাহোলেমান হামিদা" বলিতেছিলেন, তখন আকাশের প্রান্তদেশ হইতে সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি জাগিতেছিল— "রাব্বানা লাকাল হামদ"। কথিত আছে, বড় পীর সাহেবের এই এমামতে বাগদাদের সকল নরনারী, আকাশের ফেরেশ্‌তাগণ এবং পাতালের জ্বিন-দৈত্য নামাজ পড়িয়াছিল।

খলিফা প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া হইতে রক্তস্রাব প্রবাহিত

বাগ্‌দাদের তদকালীন্ খলিফা আল্-মস্তান্‌জিদ বিল্লাহ একবার বড় পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাপূর্ণ দশটী থলিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন। বড় পীর সাহেব উহা গ্রহণ না করিয়া করিলেন—বাবা! আমি কোন রাজা-বাদশাহ্ কিম্বা জমিদার-মহাজনের উপহার গ্রহণ করি না। কারণ উহা অধিকাংশ গরীব-কাঙালের বুক-চেরাধন—জুলুমের

সহিত সংগৃহীত। ইহা শুনিয়া খলিফা কহিলেন—হুজুর! আমার এ অর্থ নির্দ্দোষ, আপনি ইহা নিঃসন্দেহে লইতে পারেন, আমি কোন অন্যায়লব্ধ মুদ্রা আপনাকে দিতে আসি নাই। বড় পীর সাহেব তথাচ উহা লইতে স্বীকৃত হইলেন না, এদিকে খলিফাও নাছোড়বান্দা। তখন বড় পীর সাহেব কহিলেন, আচ্ছা, আপনি ইহার মধ্যে মাত্র দুইটী থলিয়া আমাকে বাছিয়া দিন, এবং বাকীগুলি লইয়া যান। অগত্যা খলিফা দুইটী থলিয়া বড় পীর সাহেবকে দিলেন। বড় পীর সাহেব এক এক করিয়া থলিয়া দুইটীর মুখ খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে অতি টাট্কা রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভয়ে খলিফার মুখ শুকাইয়া গেল। অতঃপর পীর সাহেব থলিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"গরীব প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া আপনারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তাহার পরিণতি দেখুন।"

বালিকা হরণ করায় দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যের চরম শাস্তি

আবু সঈদ আহমদ বিন আদী বর্ণনা করিয়াছেন—আমার একটী পরমাসুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা হঠাৎ বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। অনেক অনুসন্ধানেও তাহার খোঁজ মিলিল না। অবশেষে স্থির হইল যে, মেয়েটীকে জ্বিনে লইয়া গিয়াছে। আমি বড় পীর সাহেবের খেদ্‌মতে উপস্থিত

হইয়া আমার বিপদের কাহিনী পেশ করিলাম। ইহাতে বড় পীর সাহেব আমাকে একটী দোওয়া শিখাইয়া দিয়া কহিলেন—বাবা! 'করেখ' মহাল্লার ভাঙ্গা বাড়ীতে যাইয়া সমস্ত রাত এই দোওয়াটী পড়িতে থাকিবে। তোমার বসিবার স্থানের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে একটী গণ্ডিরেখা দিও, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে দেখিতে পাইবে, নানা বিভীষিকাময় মূর্ত্তিতে অসংখ্য জ্বিন ইহার চতুষ্পার্শে সমবেত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তুমি মোটেই ভীত হইও না। কারণ উহারা গণ্ডিরেখা অতিক্রম করিয়া আসিয়া তোমাকে ক্ষতি করিতে পারিবে না। অতঃপর রজনীর শেষভাগে স্বয়ং জ্বিন বাদশাহ বহু সংখ্যক সৈন্য সামন্ত লইয়া তথায় উপস্থিত হইবে। তখন তাহাকে সালাম জানাইয়া বলিও, বড় পীর হজরত আব্দুল কাদের জিলানী আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। তাহার কাছে তোমার অভিযোগ পেশ করিও। বড় পীর সাহেবের নির্দ্দেশ মত আমি ঐ নির্জ্জন ভগ্ন প্রাসাদে আশ্রয় লইলাম। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে উগ্রমূর্ত্তিধারী ভীষণ আকৃতির একদল জ্বিন তথায় আসিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা আমাকে কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। রাত্রি শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে বিরাট ঘোড়ায় চড়িয়া আসিল—জ্বিনের বাদশাহ। সঙ্গে তাহার অসংখ্য সৈন্যসামন্ত। বড় পীর সাহেবের কথা তাহাকে বলিতেই সে আমার গণ্ডির বাহিরে অতি বিনীত ভাবে বসিয়া পড়িল এবং জানিতে চাহিল—আমার অভিযোগ কি? আমি তাহার কাছে আমার

অভিযোগের কাহিনী বিবৃত করিলাম। অতঃপর বাহশাহ উপস্থিত জ্বিনদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বলিতে পার, এই ব্যক্তির কন্যাকে কে হরণ করিয়াছে? কিন্তু কেহই ইহার উত্তর দিতে পারিল না। তখন বাদশাহ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গুপ্তচর পাঠাইয়া দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে চীন দেশ হইতে একটী দৈত্যকে উক্ত বালিকা সহ গ্রেফতার করিয়া আনা হইল। বাদশাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন সে বালিকাটীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। দৈত্যটী উত্তর দিল বালিকাটী অতিরিক্ত রূপশী। আমি তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া উহাকে বিবাহ করিতে চাই। হঠাৎ নৈশ আঁধার ভেদ করিয়া বাদশাহের নিষ্কাষিত তরবারি ঝলিয়া উঠিল, বাদশাহ হুঙ্কার দিয়া কহিল, "পিশাচ! তুই দৈত্যকুলের কলঙ্ক, এখনই তোর বিবাহের সাধ মিটাইয়া দিতেছি, এই বলিয়া সে এক আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিল। বাদশাহ মেয়েটীকে আমার হাতে দিয়া কহিল, যাও বাবা, অতঃপর ইহাকে সাবধানে রাখিও।

খড়ম নিক্ষেপ করিয়া বহুদূরের দস্যুহত্যার রহস্য

শেখ ওমরু উসমান সাইরিফিনী এবং শেখ আব্দুল হক হারিমী বর্ণনা করিয়াছেন—আমরা প্রায়ই বড় পীর সাহেবের সহিত রাত্রিতে তাঁহার মাদ্রাসায় অবস্থান করিতাম। ৫৫৫ হিজরীর ৩রা সাফর রবিবার রাত্রিতে আমরা তথায় ছিলাম।

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলাম, হুজুর তাঁহার সন্দল কাষ্ঠের খড়ম পাছটী পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং অজু করিয়া আসিয়া দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে হুজুর একটী বিকট শব্দ করিয়া একখানি খড়ম দূরে নিক্ষেপ করিতেই উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। আর একটু পরেই ঐ ভাবে অন্য খড়ম খানা নিক্ষেপ করিলেন। আমরা সাহস করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ঘটনার এক মাস পরে একদল ভিন্ন দেশীয় সওদাগার অনেক গুলি মূল্যবান উপঢৌকন লইয়া বড় পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। তাহারা জিনিষ পত্র গুলি সযত্নে বড় পীর সাহেবের পদপ্রান্তে রাখিয়া কহিল—হুজুর, আমরা অতি দূর দেশ হইতে পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্য লইয়া বাগ্‌দাদাভিমুখে আসিতেছিলাম, গত ৩রা সাফর রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য আমরা একস্থানে তাঁবু খাটাইয়া অবস্থান করিতেছি, এমন সময়ে গভীর রাত্রিতে একদল বেদুঈন দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহারা আমাদের কাহাকেও কাহাকেও হত্যা করিয়া আমাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। আমরা কেহ কেহ নিকট জঙ্গলে লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করি। আমরা তথা হইতে দেখিতে পাইলাম। দস্যুগণ তাহাদের দুইজন সঙ্গীদের সম্মুখে আমাদের লুণ্ঠিত মালপত্র পরস্পরের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিতেছে। আমরা দস্যুদলের এই হৃদয়হীন আচরণ এবং আমাদের শোচনীয় পরিণতির কথা ভাবিতেছি, হঠাৎ হুজুরের

কথা আমাদের মনে উঠিল। আমরা পরস্পর বলা কওয়া করিতেছিলাম হায়, মালপত্র লইয়া যদি নিরাপদে আমরা বাগ্-দাদে পৌঁছিতে পারিতাম, তাহা হইলে বড় পীর সাহেবকে এক বিপুল উপহার দিয়া ধন্য হইতাম। এই কথাগুলি বলা মাত্রই আমরা দস্যুদলে এক বিরাট কোলাহল শুনিতে পাইলাম। আরও দেখিলাম, তাহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ণ করিতেছে। কিছুক্ষণ পর সবই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আমরা সাহসে ভর করিয়া ঘটনা স্থলে যাইয়া দেখি, আমাদের মাল পত্রগুলি সেইখানে সবই পড়িয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু ইহার পার্শ্বে দুইজন দস্যু সর্দ্দারকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তাহাদের মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের মাথার কাছে এক একখানি খড়ম। হুজুর! এই দেখুন সেই খড়ম আমরা লইয়া আসিয়াছি।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বড় পীর সাহেবের শব্দ করিয়া খড়ম নিক্ষেপের রহস্য তখনই বুঝিতে পারিলাম।

বড় পীর সাহেবের ওয়াজের মহফিলে বসিয়া এক ব্যক্তির বহুদূরে মলত্যাগ

আবদুল মাওয়ালী মোহাম্মদ বিন্ আহমদ নামক বাগ্দাদের এক ধনাঢ্য সওদাগার বর্ণনা করিয়াছেন—আমি একদিন বড় পীর সাহেবের উপদেশ প্রদান শুনিতেছিলাম। হঠাৎ আমার

এমন মলত্যাগের বেগ হইল যে, আমি তাহা কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিলাম না। অসহ্য যন্ত্রনায় আমি অতিরিক্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। সভার জনসমুদ্র ঠেলিয়া একেত বাহির হইয়া যাইবার উপায় নাই, তাহার উপর হুজুরের বক্তৃতা ছাড়িয়া উঠিবার শক্তি বা সাহস আমাদের ছিল না। সুতরাং প্রকৃতির তাড়নাকে যত দমন করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, ততই আমার অধীরতা বাড়িতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলাম—হুজুর বক্তৃতা মঞ্চ হইতে ধাপে ধাপে নীচে নামিয়া অসিতেছেন। আমি ইহাও দেখিলাম যে, মঞ্চোপরি থাকিয়াও হুজুর বক্তৃতা দিতেছেন। হুজুর যে আমার দিকে চলিয়া আসিতেছেন, তাহা অন্য লোকে দেখিতে পাইতেছে না। যাহা হউক হুজুর আমার কাছে আসিয়া তাঁহার বিরাট জুব্বার আস্তিনের ভিতর আমার মাথা ঢুকাইয়া দিলেন, এবং আমাকে তাঁবুর মত ঢাকিয়া রাখিলেন। নিমেষের মধ্যে দেখিতে পাইলাম, আমি যেন এক দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠের ভিতর। ইহার একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র নদীকূলে নিবিড় বন জঙ্গল। আমি আমার চাবির গুচ্ছটী একটী বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া মলত্যাগ করিতে বসিলাম। অতঃপর পরিতৃপ্ত হইয়া আমি উক্ত নদীর পানিতে পাক্ সাফ্ অন্তে কূলে দাঁড়াইয়া দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করিলাম। সালাম ফিরাইয়া দেখি, আমি পূর্ব্বস্থানে বসিয়া বড় পীর সাহেবের বক্তৃতা শুনিতেছি, আমার এই ঘটনা স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতাম, কিন্তু তাহা করিবার উপায় নাই। কারণ প্রকৃতির

তাড়নায় আমি জাগ্রতভাবে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ছিলাম তাহা স্বপ্ন নহে। তা'ছাড়া নামাজের জন্য আমি যে অজু করিয়াছিলাম তাহার চিহ্ন তখনও বর্ত্তমান। তার উপর সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য আমার চাবি গাছটি, উহা গাছে বাধাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। আসিবার সময়ে উহা আনিতে স্মরণ ছিল না। কোন্ দেশে আমি গিয়াছিলাম, তাহা কোথায় এবং কতদূর কে বলিতে পারে? আমি এই ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। ইহার কিছুদিন পরে আমাকে ইরান্ দেশে বাণিজ্য যাত্রা করিতে হয়। বাগ্দাদ হইতে ১৪ দিন হাটিবার পর কাফেলা এক বিশাল প্রান্তরে উপস্থিত হইল। আমরা বিশ্রামের জন্য তথায় ছাউনী নির্ম্মাণ করিলাম। আমি উক্ত প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থানে দেখিতে পাইলাম, একটি নিবিড় বনের পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমি পূর্ব্বে এই দেশে কিম্বা এই স্থানে কখনও আসি নাই। অথচ এই জায়গাটুকু যেন আমার নিকট খুবই পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটি বৃক্ষ শাখায় আমার চাবীর গুচ্ছটি যখন লট্কানো পাইলাম, তখন আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কোথায় আসিয়াছি। বাগ্দাদে ফিরিয়া আমি আমার এই কাহিনী বড় পীর সাহেবকে বলিতে গেলে তিনি আমাকে কাণে কাণে বলিয়া দিলেন— "বাবা, আমি বাঁচিয়া থাকিতে এইকথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিও না।"

এমন মলত্যাগের বেগ হইল যে, আমি তাহা কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিলাম না। অসহ্য যন্ত্রনায় আমি অতিরিক্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। সভার জনসমুদ্র ঠেলিয়া একেত বাহির হইয়া যাইবার উপায় নাই, তাহার উপর হুজুরের বক্তৃতা ছাড়িয়া উঠিবার শক্তি বা সাহস আমাদের ছিল না। সুতরাং প্রকৃতির তাড়নাকে যত দমন করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, ততই আমার অধীরতা বাড়িতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলাম—হুজুর বক্তৃতা মঞ্চ হইতে ধাপে ধাপে নীচে নামিয়া অসিতেছেন। আমি ইহাও দেখিলাম যে, মঞ্চোপরি থাকিয়াও হুজুর বক্তৃতা দিতেছেন। হুজুর যে আমার দিকে চলিয়া আসিতেছেন, তাহা অন্য লোকে দেখিতে পাইতেছে না। যাহা হউক হুজুর আমার কাছে আসিয়া তাঁহার বিরাট জুব্বার আস্তিনের ভিতর আমার মাথা ঢুকাইয়া দিলেন, এবং আমাকে তাঁবুর মত ঢাকিয়া রাখিলেন। নিমেষের মধ্যে দেখিতে পাইলাম, আমি যেন এক দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠের ভিতর। ইহার একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র নদীকূলে নিবিড় বন জঙ্গল। আমি আমার চাবির গুচ্ছটী একটী বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া মলত্যাগ করিতে বসিলাম। অতঃপর পরিতৃপ্ত হইয়া আমি উক্ত নদীর পানিতে পাক্ সাফ্ অন্তে কূলে দাঁড়াইয়া দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করিলাম। সালাম ফিরাইয়া দেখি, আমি পূর্ব্বস্থানে বসিয়া বড় পীর সাহেবের বক্তৃতা শুনিতেছি, আমার এই ঘটনা স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতাম, কিন্তু তাহা করিবার উপায় নাই। কারণ প্রকৃতির

তাড়নায় আমি জাগ্রতভাবে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম তাহা স্বপ্ন নহে। তা'ছাড়া নামাজের জন্য আমি যে অজু করিয়াছিলাম তাহার চিহ্ন তখনও বর্ত্তমান। তার উপর সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য আমার চাবি গাছটি, উহা গাছে বাধাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। আসিবার সময়ে উহা আনিতে স্মরণ ছিল না। কোন্ দেশে আমি গিয়াছিলাম, তাহা কোথায় এবং কতদূর কে বলিতে পারে? আমি এই ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। ইহার কিছুদিন পরে আমাকে ইরান্ দেশে বাণিজ্য যাত্রা করিতে হয়। বাগ্‌দাদ হইতে ১৪ দিন হাটিবার পর কাফেলা এক বিশাল প্রান্তরে উপস্থিত হইল। আমরা বিশ্রামের জন্য তথায় ছাউনী নির্ম্মাণ করিলাম। আমি উক্ত প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থানে দেখিতে পাইলাম, একটি নিবিড় বনের পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমি পূর্ব্বে এই দেশে কিম্বা এই স্থানে কখনও আসি নাই। অথচ এই জায়গাটুকু যেন আমার নিকট খুবই পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটি বৃক্ষ শাখায় আমার চাবীর গুচ্ছটি যখন লট্‌কানো পাইলাম, তখন আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কোথায় আসিয়াছি। বাগ্‌দাদে ফিরিয়া আমি আমার এই কাহিনী বড় পীর সাহেবকে বলিতে গেলে তিনি আমাকে কাণে কাণে বলিয়া দিলেন—"বাবা, আমি বাঁচিয়া থাকিতে এইকথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিও না।"

বড় পীর সাহেবের দোওয়ায় বৃষ্টিপাত বন্ধ

একদিন মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বড় পীর সাহেব ওয়াজ করিতে ছিলেন, হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হইল। এইরূপ অবস্থায় উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া লোকদের পক্ষে ওয়াজ শ্রবণ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে ছুটিল। বড় পীর সাহেব ইহা দেখিয়া মেঘের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন—"ওহে মেঘ! আমি লোকদিগকে খোদার কথা শুনাইতে ডাকিয়াছি আর তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেছ?" আশ্চর্য্যের বিষয় হুজুরের এই কথা বলামাত্র মেঘ সরিয়া গেল, বর্ষণ বন্ধ হইল এবং রৌদ্র উঠিল। কিন্তু ওয়াজের স্থানটুকু ব্যতীত অন্য স্থানে রীতিমত বর্ষণ হইতেছিল।

বার সের ময়দায় এক পরিবারের পাঁচ বৎসর চলিল

একবার বাগদাদে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বড় পীর সাহেবের বাবুর্চ্চী আবুল আব্বাস আহমদ এক দিন তাঁহাকে কহিল, হুজুর! আমার গৃহে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে

মাত্র কয়দিন চলিবে। বড় পীর সাহেব তখন তাহাকে বার সের ময়দা দিয়া কহিলেন, ইহা একটি পাত্রে রাখিয়া দাও, এবং উহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখ। যখন ইহা বাহির করিবার প্রয়োজন হইবে, এক ধারে সামান্য একটু খুলিয়া বাহির করিবে। খবরদার কখনও উহার মুখ খুলিয়া পাত্রটির ভিতরে দেখিবার চেষ্টা করিও না। বড় পীর সাহেবের কথা অনুসরণ করিয়া বাবুর্চ্চী চলিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দৈনিক প্রয়োজনমত ময়দা খরচ করিয়াও পাত্র শূন্য হয় না। এই ভাবে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর চলিল, তবুও বার সের ময়দার শেষ নাই। অবশেষে এক দিন তাহার স্ত্রী কৌতূহলী হইয়া পাত্রের মুখ খুলিয়া ফেলিল, এবং উহার ভিতরে সাত সের ময়দা পাইল। বড় পীর সাহেব এই কথা শুনিয়া বাবুর্চ্চীকে ভর্ৎসনা স্থলে বলিয়া ছিলেন—"তোমরা হতভাগ্য। তাই আমার উপদেশ ভুলিয়া গিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিয়াছ। পাত্রটির মুখ না খুলিলে ঐ ময়দার দ্বারা তোমাদের আজীবন চলিত।"

আল্লাহর নামে মৃত চিলে প্রাণ সঞ্চার

এক দিন হজরত বড় পীর সাহেব এক স্থানে ওয়াজ ফরমাইতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর মাথার উপর একটি চিল উড়িয়া লোকদিগকে ভীষণ বিরক্ত করিতেছিল।

হুজুর ইহা দেখিয়া বিরক্তভাবে বাতাসকে আদেশ করিলেন—“হে বাতাস, পাজী চিলটির মাথা কাটিয়া আন!” হুজুরের মুখ হইতে কথা শেষ না হইতেই চিলটী ছিন্ন মস্তকে মাটিতে পড়িয়া গেল। ওয়াজ শেষ হইলে হুজুর চিলের মাথাটী তাহার দেহের সহিত সংলগ্ন করিয়া কহিলেন—“পরম দয়ালু আল্লাহর নামে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।” তখনই চিলটী জীবিত হইয়া উড়িয়া গেল।

বড় পীর সাহেবের দোওয়ায় এক ব্যক্তির পুত্র-সন্তান লাভ

স্পেহানবাসী শেখ আলী আরবী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি কোন এক মজ্‌যুব্‌ দরবেশের উপদেশ অনুসারে বড় পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—হুজুর! আমার কোন সন্তানাদি নাই। খোদার কাছে দোওয়া করুন যেন আমি একটী সন্তান লাভ করিতে পারি। বড় পীর সাহেব কিছুক্ষণ চক্ষু বুঁজিয়া কাশফ্‌ করিবার পর কহিলেন, সন্তান লাভ তোমার তক্‌দীরে নাই। সুতরাং দোওয়া করিলে কি লাভ হইবে? লোকটী উত্তর দিলেন, যদি সন্তান লাভ আমার অদৃষ্টে থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই একদিন উহা পাইতাম। সুতরাং আপনার দোওয়া লইবার কোনই প্রয়োজন থাকিত না, কিন্তু আমি খোদার সেই অনুগ্রহ

হইতে বঞ্চিত বলিয়াই আপনার নিকট ইহার প্রতিকার লাভের জন্য আসিয়াছি। লোকটীর এইরূপ নির্ভীক উত্তর শুনিয়া বড় পীর সাহেব খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন—আমার ভাগ্যে মাত্র আর একটী পুত্র সন্তান রহিয়াছে, উহা তোমাকেই দান করিলাম। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। আমার পৃষ্ঠদেশে তোমার পৃষ্ঠ ঘর্ষণ কর, ইন্‌শা-আল্লাহ তুমি অচিরে পুত্র সন্তান লাভ করিবে। লোকটী তাহাই করিলেন। অতঃপর বড় পীর সাহেব তাঁহাকে কহিলেন—ছেলেটী জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম মহিউদ্দীন রাখিও, সে এক জন যুগের মহাদার্শনিক হইবে। বড় পীর সাহেবের কথা বর্ণে বর্ণে খাটিয়া গিয়াছিল। এই বালকটী উত্তর কালে "শেখ আক্‌বর" নামে ভুবন বিখ্যাত দার্শনিক রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চল্‌তি নাম ছিল "এবনে আরবী"।

গোর হইতে উঠিয়া বড় পীর সাহেবের সহিত এমাম হাম্বলীর সাক্ষাৎ

শেখ আদী এব্‌নে হিতি বর্ণনা করিয়াছেন—এক সময়ে আমি এবং শেখ বাকা এব্‌নে বাতু বড় পীর সাহেবের সহিত এমাম আহমদ এবনে হাম্বলীর কব্‌র জেয়ারাত করিতে গিয়াছিলাম। আমরা দেখিতে পাইলাম, কাহারও গৃহে কোন সম্মানিত অতিথি গেলে যেমন সে তাঁহাকে সমাদরে

গ্রহণ করে, এমাম হাম্বলী সেই ভাবে কব্‌র হইতে উঠিয়া বড় পীর সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বুকে বুকে মিশিবার পর তাঁহাকে সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ একটী বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। অতঃপর এমাম্ সাহেব, বড় পীর সাহেবের নিকট শরিয়ত, মারেফাত এবং হকিকত সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

বড় পীর সাহেবের দোওয়ার কল্যাণে কন্যা পুত্রে পরিণত

শেখ শেহাবুদ্দিন সাহ্‌রাওয়ার্দ্দীর পিতা বর্ণনা করিয়াছেন—আমি সন্তানহীন জীবনের ব্যথা লইয়া কাল কাটাইতেছিলাম। অবশেষে আমার গৃহিণী একদিন বড় পীর সাহেবের খেদমত শরীফে উপস্থিত হইয়া পুত্র লাভের অভিলাষ জানাইল। বড় পীর সাহেব কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া কহিলেন—"যাও, তোমার মনোবাঞ্ছা খোদা পূর্ণ করিবেন।" অতঃপর আমার স্ত্রী গর্ভ ধারণ করিয়া যথা সময়ে একটী কন্যা প্রসব করিল। আমি তখন উর্দ্ধশ্বাসে বড় পীর সাহেবের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া কহিলাম—হুজুর, আপনি আমার বিবিকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়া ছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে একটী কন্যা প্রসব করিয়াছে। বড় পীর সাহেব ইহা শুনিয়া বিন্দু মাত্রও বিলম্ব না করিয়া কহিলেন—গৃহ ফিরিয়া যাও, এবং ভাল

করিয়া দেখ তোমার পুত্র সন্তানই হইয়াছে। ইহার নাম শেহাবুদ্দিন রাখিবে, এই বালক কালে যুগের অন্যতম ওলী হইবে। আমি গৃহে ফিরিয়া দেখি সত্যই একটী পুত্র হইয়াছে। তবে পূর্ব্বে তিনি যে কন্যা দেখিলেন, তাহাও ভুল নহে। বড় পীর সাহেবের কথার সত্যতা রক্ষার জন্য খোদার এই মহিমা। শেখ শেহাবুদ্দিনের চরিত্র এবং মেজাজ অনেকটা মেয়েলী ধরণের ছিল। মেয়েদের মত তাঁহার বক্ষঃস্থল উন্নত ছিল।

গোশতের হাড্ডি হইতে জীবন্ত মোরগ

একবার কোন স্ত্রীলোক তাহার একটী ছেলেসহ বড় পীর সাহেবের নিকট আসিয়া কহিল—হুজুর! আমার এই ছেলেটী আপনার প্রতি খাস্ মহাব্বত রাখে, আমি মাতৃত্বের দাবী ত্যাগ করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ আপনার খেদমতে উৎসর্গ করিলাম। বড় পীর সাহেব তাহাকে নিজের দরবারে রাখিয়া সংযম ও আধ্যাত্মিকতার রীতিনীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে বালকের জননী তাহার ছেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিল, কঠোর কৃচ্ছ-সাধনা এবং রাত্রি জাগরণ ইত্যাদিতে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং কৃশ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু মাতা দেখিল, তাহার ছেলে শুধু শুষ্ক রুটী ভক্ষণ করিতেছে, ইহাতে তাহার মনে অতিশয় ব্যথা লাগিল। স্ত্রীলোকটী অতঃপর বড় পীর

সাহেবের নিকট যাইয়া দেখিতে পাইল, তিনি মোরগের গোশ্ত দিয়া রুটী ভক্ষণ করিতেছেন, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, একপ্রকার ঝাঁঝালো সুরে বড় পীর সাহেবকে কহিল —আপনি মোরগের গোশ্ত দিয়া রুটী খাইতেছেন আর আমার বাছাকে খাইতে দেন শুখ্না রুটী! তাহার শরীর মাটী হইয়া গিয়াছে। বড় পীর সাহেবের সম্মুখে একখানি মোরগের হাড্ডি পড়িয়া ছিল, ইহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি কহিলেন, "খোদার হুকুমে ওঠ্।" অমনি একটী মোরগ ডানা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ডাকিল "কূউ—কূ"। বড় পীর সাহেব স্ত্রীলোকটীকে কহিলেন—তোমার ছেলে যখন এইভাবে মৃত জ্যান্ত করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে, তখন সে মোরগের গোশ্ত ভক্ষণ করিতে পাইবে।

জনৈক ভক্তের সম্মুখে অজ্ঞাত রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন

আবু হাফ্স্ ওমার বিন মোহাম্মদ বর্ণনা করিয়াছেন—একবার আমার পীর আবুল হাসান আদী বিন হিতি আমাকে ধরিয়া বড় পীর সাহেবের খেদ্মতে লইয়া গেলেন এবং পরিচয় দিলেন আমি তাঁহার বিশিষ্ট ভক্ত। বড় পীর সাহেব আমাকে একটী জামা পরাইয়া দিয়া কহিলেন—"ইহা স্বাস্থ্য সংরক্ষণ জামা।" আমি উহা গায়ে ব্যবহার করিতে লাগিলাম, অতঃপর ৬৫ বৎসর

পর্য্যন্ত আমার মাথাটুকু পর্য্যন্ত ধরে নাই। আমি সম্পূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্য লইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কালাতিপাত করিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পরে আমার পীর পুনরায় আমাকে বড় পীর সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন, এবং কোন আধ্যাত্মিক জামা দিতে অনুরোধ করিলেন। এই কথা শুনিয়া বড় পীর সাহেব কিছুক্ষণের জন্য মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। এই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম, একটী বৈদ্যুতিক আলোক হুজুরের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া আমাকে বেষ্টন করিল, আমি তখন যেন এক অপরূপ রহস্যময় রাজ্যে নীত হইলাম, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সমাহিত কোটী কোটী মৃতদেহ, তাহাদের অবস্থা আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, আমি আরও দেখিতে পাইলাম কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফেরেশতাগণ তাঁহাদের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন স্বরে খোদার স্তুতিও আমার কর্ণগোচর হইল, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পেশানীতে লিখিত বিষয় আমি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম। আকাশের উপর হইতে সপ্ত ভূমিতলের নিম্ন পর্য্যন্ত সকল স্থানের অনেক অজ্ঞাত রহস্য আমার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। এই সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া আমার মনে কি যেন এক অজ্ঞাত ভয়ের সঞ্চার হইল, আমি যেন আমার বাহ্যিক জ্ঞান ও চেতনা হারাইতে বসিয়াছিলাম, সহসা বড় পীর সাহেব তাঁহার পবিত্র হস্ত আমার বক্ষঃস্থলে রাখিতেই আমার ভয় ও ত্রাস দূর হইয়া গেল।

বড় পীর সাহেবের পোষাকের সমালোচনা করায় এক ব্যক্তির বিপদ

আবুল ফজল বিন কাসেম্ বলিয়াছেন—একবার বড় পীর সাহেবের জনৈক খাদেম আমার নিকট তাঁহার জন্য বস্ত্র ক্রয় করিতে আসিল, সে এমন দামী এবং মনোরম কাপড় পছন্দ করিল, যাহার প্রতিগজের মূল্য এক দীনার। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এমন সৌখীন কাপড় কি বড় পীর সাহেব পরিধান করিবেন? চাকরটী উত্তর দিল—হাঁ, তিনি এইরূপ কাপড়ই পরিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া আমার মনে আপনিই উদয় হইল, যিনি সাধু—সুফী, তাঁহার পক্ষে এইরূপ সৌখীন পরিচ্ছদ পরিধানের প্রয়োজনীয়তা কি রহিয়াছে! সহসা আমার পায়ে একটী পেরেক বিদ্ধ হইলে আমি দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন প্রকারে পেরেকটী বাহির করা গেল না। অগত্যা নিরূপায় হইয়া আমি বড় পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া আমার বিপদের কথা জানাইলাম। হুজুর হাসিয়া কহিলেন, মৃত ব্যক্তির পোষাকের সমালোচনা করিলে পায়ে পেরেক ফুটিয়া থাকে। মনে রাখিও মানুষ মাত্রই মৃত, তা ছাড়া মাহ্‌বুবের কাছে যাইতে হইলে উত্তম পরিচ্ছদ পরিয়া যাইতে হয়। আমি সেই জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি, কোন্ মুহূর্ত্তে তিনি আমাকে আহ্বান

করিবেন, জানি না। ইহা বলিয়া হুজুর তাঁহার পবিত্র হস্ত আমার ক্ষত স্থানে স্পর্শ করা মাত্রই জ্বালা যন্ত্রণা মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া হুজুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

বড় পীর সাহেবের দোওয়ায় একজন উষ্মিলোকের সৌভাগ্য লাভ

শেখ আবুল হাসান বিন আলী তাহের বর্ণনা করিয়াছেন—এক সময়ে আমি এবং আমার এক বন্ধু হজ্ করিয়া বাগ্দাদে পৌঁছিলাম। আমাদের নিকট একখানি ছুরিকা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, আমরা উহা বিক্রয় করিয়া যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্য কিনিলাম, উহা দিয়া আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না। এই অবস্থায় আমরা বড় পীর সাহেবের ওয়াজ শুনিতে গেলাম, আমরা মহ্ফিলের এক কোণে বসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ বড় পীর সাহেব তাঁহার ওয়াজে ক্ষান্ত দিয়া কহিলেন—দুইজন হাজী বাগ্দাদে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের নিকট মাত্র একখানি ছুরি অবশিষ্ট ছিল, তাই বিক্রয় করিয়া তাহারা সামান্য কিছু খাদ্য কিনিয়া খাইয়াছে, ইহার দ্বারা তাহাদের ক্ষুধা দূর হয় নাই। কিছুক্ষণ পর বড় পীর সাহেবের বক্তৃতাদান শেষ হইল। তিনি একজনকে দাস্তারখান বিছাইতে আদেশ করিলেন। আমরা দুই বন্ধু তখন খাদ্য দ্রব্য লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম, আমার

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখন কি খাদ্য পাইলে খুশি হও? সে কহিল, চানা দিনা দুম্বার গোশত্ খাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। আমি বলিলাম, মধু খাইতে আমার সাধ যায়, অনেক দিন ঐ জিনিষটা আমার খাওয়া হয় নাই। আমরা এইরূপ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতেছি, এমন সময়ে বড় পীর সাহেবের এক খাদেম আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া ঐ দাস্তারখানে বসাইল, তথায় আমার সম্মুখে বড় এক পেয়ালা টাটকা মধু এবং আমার বন্ধুটীর সম্মুখে এক বাসন চানা দিয়া ভোনা দুম্বার গোশ্ত আনীত হইল, ইহা দেখিয়া আমি নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিলাম না, ছুটিয়া গিয়া হুজুরের পায়ের উপর পড়িলাম। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং কহিলেন "হে, মিসরের ধর্ম্ম প্রচারক! তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি।" এই কথা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর! আমি লেখাপড়া আদৌ জানি না, কি করিয়া ইহা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে? হুজুর কহিলেন, খোদার ইচ্ছায় কি না হইতে পারে? অতঃপর আমি বড় পীর সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিতে শুরু করিলাম। অন্যের পক্ষে যাহা শিক্ষা করিতে ২০।২৫ বৎসর সময়ের দরকার, আমি মাত্র এক বৎসরে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত করিলাম।

অতঃপর বড় পীর সাহেব আমাকে দামেস্কে যাইতে বলিয়া কহিলেন, তুমি দামেস্কে যাইয়া দেখিবে, তথাকার রাজা মিসর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, রাজাকে বলিও, এই অভিযানে তিনি জয়লাভ করিতে পারিবেন না, পরবর্ত্তী অভিযানে তাঁহার

জয় অবধারিত। অতঃপর তুমি মিসরে যাইয়া দেখিতে পাইবে, মিসরের বাদশারও প্রতি-আক্রমণের জন্য এক বিপুল বাহিনী সজ্জিত করিয়াছেন, তাঁহাকে জানাইবে, এই অভিযানে তাঁহার জয় সুনিশ্চিত, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযান তাঁহার পক্ষে শুভ নহে। সত্যই তাহাই ঘটিয়া গেল। প্রথম যুদ্ধে মিসর বাহিনী জয়লাভ করিলে রাজা আমাকে বিপুল অর্থ দিলেন, দ্বিতীয় যুদ্ধেও ঐরূপ পুরস্কার আমি লাভ করিলাম। এমন কি দামেস্কের বাদশাহ আমাকে পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত করিলেন।

বড় পীর সাহেবের দোওয়ায় একব্যক্তির ভাগ্যলেখা পরিবর্ত্তন

পীর আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন—বড় পীর সাহেবের একজন বিশিষ্ট নেক্‌কার খাদেম এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি যেন পরিচিত ও অপরিচিত ৭০টী স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া তাহার মনে এক ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি হইল। তিনি অবশিষ্ট রাত্রটুকু ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলেন, প্রভাতে উঠিয়াই তিনি বড় পীর সাহেবের নিকট যাইয়া তাঁহার স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহিলেন এবং এই অভিনব স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করিলেন। বড় পীর সাহেব তাহার ব্যাকুলতায় সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, ভয় করিও না, খোদা তোমাকে কুপ্রবৃত্তির হাত হইতে রেহাই দিয়াছেন, আমি এক রাত্রে লাওহ্

মাহফুজে লিখিত তোমার নামের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম তুমি অমুক অমুক ৭০টী স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিবে, তাই খোদার কাছে দোওয়া করায় তিনি বাস্তব হইতে উহা স্বপ্নে পরিণত করিয়া দিয়াছেন।

বড় পীর সাহেবের ভয়ে লম্পট দৈত্যের পলায়ন

একদা ইস্‌পেহানবাসী জনৈক লোক বড় পীর সাহেবের নিকট আসিয়া কহিল—হুজুর! আমার যুবতী স্ত্রীর উপর জ্বিনের আসর পড়িয়াছে। সে অধিকাংশ সময়ে ঘোর অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। জ্বিন দূরীভূত করিবার জন্য বহু মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়-ফুক এবং ওঝা-কবচের আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু কোনই সুফল হইতেছে না। আমি বড় আশা করিয়া হুজুরের নিকট আসিয়াছি। হুজুর ইহার প্রতিবিধান করিয়া আমার মান-ইজ্জত রক্ষা করুন।

লোকটীর কাতর উক্তি শুনিয়া হজরত বড় পীর সাহেব তাহাকে কহিলেন—তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া যাও এবং রোগিণীর কাণে কাণে যাইয়া বল—"হে খানেস্! বাগ্‌দাদবাসী শেখ আব্দুল কাদের তোমাকে বলিতেছেন—তুমি এই মুহূর্ত্তে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর, আর কখনও এমুখো হইলে তুমি মারা পড়িবে।" লোকটী গৃহে ফিরিয়া হজরত বড় পীর

সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করা মাত্রই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল। আর কোন দিন তাহার উপর দৈত্যের দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হয় নাই। আরও কথিত আছে, বড় পীর সাহেব জীবিত থাকা অবধি বাগ্‌দাদ নগরীতে কোন দিন কোন স্ত্রীলোকের উপর জ্বিনের উৎপাত পরিলক্ষিত হয় নাই। কোন খবিস জ্বিন বড় পীর সাহেবের জালালী মেজাজের ভয়ে বাগ্‌দাদের ত্রিসীমায় পা দিতে সাহসী হইত না।

বড় পীর সাহেবকে ধাক্কা দেওয়াতে পীর হাম্মাদের দক্ষিণ হস্ত বিনষ্ট

একবার বড় পীর সাহেব 'শুনিজি' নামক গোরস্তানে পীর হাম্মাদের গোর জিয়ারত্‌ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বহু লোক ছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে গোরস্তানের বালুকা-কণা এমন উত্তপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাতে পা রাখা যায় না। তবুও বড় পীর সাহেব সেই প্রখর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত গোর জেয়ারত্‌ কার্য্যে লিপ্ত রহিলেন। তাঁহার মধ্যে কোন বিচলতা ছিল না। অতঃপর তাঁহার জেয়ারত্‌ কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি একস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তাঁহার মুখে তখন আনন্দের চিহ্ন প্রকটমান। ইহা দেখিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ বিনীতভাবে নিবেদন করিল—হুজুর! বহুদিন পরে আজ

আপনার মুখে আনন্দ চিহ্ন দেখিতেছি, ইহার কারণ আমাদের জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। অনুচরবর্গের আগ্রহাতিশর্য্যে বড় পীর সাহেব কহিলেন, আমি ৪৯৯ হিজরীর ১৫ই শাবান জুম্‌আর দিবস পীর হাম্মাদের সহিত রাফাসার জামে মস্‌জিদে জুমআ পড়িতে যাইতেছিলাম। আমরা একটি ক্ষুদ্র নদীর সেতু পার হইতেছি, অকস্মাৎ উক্ত পীর সাহেব আমাকে ধাক্কা দিয়া পানিতে ফেলিয়া দিলেন। তখন ভীষণ শীতকাল, আমার পরিধেয় গরম বস্ত্র সমস্তই ভিজিয়া গেল। আমি নদী হইতে উঠিয়া ঐ অবস্থায় মস্‌জিদের দিকে গমন করিলাম। শীতে আমার ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল। আমার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পীর হাম্মাদ কহিলেন—হে আব্দুল কাদের! তুমি বিরক্ত হইও না, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি এই অন্যায় আচরণ কারিয়াছি। দেখিলাম তুমি পর্ব্বতের মত অচল—অটল।" আজ আমি সেই পীর হাম্মাদের গোর জিয়ারত করিতে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পরিধানে এক জোড়া বহুমূল্য রত্নখচিত চাদর। তাঁহার মস্তকে একটী ইয়াকুতের তাজ, তাঁহার হস্তে কয়েকটী স্বুবর্ণের বালা, তাঁহার পদদ্বয়ে এক জোড়া অমূল্য জহরত দিয়া তৈয়ায়ী জুতা রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সম্পূর্ণ অসাড়। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, হে গওসল আজম, মনে পড়ে কি একবার এই হস্ত দিয়াই আমি তোমাকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। তারই ফলে আমার হস্তখানির এই দশা ইহয়াছে। তুমি কি আমার উক্ত

অপরাধ ক্ষমা করিবে না ? আমি কহিলাম—"নিশ্চয়ই করিব"। ইহা শুনিয়া তিনি বেশ আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে কহিলেন, তাহা হইলে এখন আমার হাত খানি সুস্থ হইবার জন্য খোদার কাছে দোওয়া কর। আমি হস্ত উত্তোলন করিয়া দোওয়া করিতে লাগিলাম। আমার সহিত গোরের মধ্যস্থ প্রায় ৫ হাজার ওলী-আল্লাহ "আমিন" "আমিন" বলিতে ছিলেন। খোদা আমার দোওয়া কবুল করিলেন, পীর হাম্মাদের হস্ত সবল হইল। অতঃপর তিনি উক্ত হস্ত দ্বারা আমার সহিত 'মোসাফাহা' করিলেন। এই কারণে আমার মনে আনন্দ জাগিয়া ছিল।

বেহেশত হইতে খলিফাকে সেব ফল প্রদান

পীর আবুল আব্বাস্ মুসেলী বলিয়াছেন—এক দিবস খলিফা মোস্তানজেদবিল্লাহ বড় পীর সাহেবের খেদমতে হাজির হইয়া কহিলেন—হুজুর ! আমার অন্তরে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আমি হুজুরের নিকট হইতে কোন একটী আলৌকিক ঘটনা দেখিতে আসিয়াছি। বড় পীর সাহেব এই কথায় আদৌ বিরক্ত না হইয়া খলিফাকে কহিলেন —আপনি কি দেখিতে চাহেন, একটীর নাম করুন। খলিফা কহিলেন—আমি বেহেশত হইতে এখনই দুইটি সেব ফল পাইতে

চাই। তখন সেব ফলের মওসুম নহে, সুতরাং ইহা তখন নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। বড় পীর সাহেব অমনি শূন্যে হাত বাড়াইলেন। দেখা গেল শূন্য হইতে একটি সেব ফলের শাখা বড় পীর সাহেবের হাতের নিকট অবনত হইয়াছে, তাহাতে দুইটী সেব ফল দুলিতেছে। তিনি ঐ ফল দুইটী পাড়িয়া একটী খলিফাকে দিলেন এবং অপরটী নিজে রাখিলেন। অতঃপর বড় পীর সাহেব খলিফাকে কহিলেন—আপনার হস্তের ফলটী ছুরি দিয়া কাটুন। বড় পীর সাহেবও তাঁহার হস্তের ফলটী কাটিলেন, কিন্তু দেখা গেল খলিফার ফলটীর ভিতর দুর্গন্ধময় কীট কিলিবিলি করিতেছে আর বড় পীর সাহেবের হস্তস্থিত ফলটীর ভিতর রসে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য হইতে অতি সুমিষ্ট গন্ধ বাহির হইতেছে। খলিফা অবাক! বড় পীর সাহেব হাসিয়া খলিফাকে কহিলেন—বাবা! ফল দুইটি একই স্থানে ছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কেন এইরূপ হইল বুঝিতে পারিয়াছেন কি? না বুঝিয়া থাকিলে শুনুন—প্রকৃত পক্ষে ফল দুইটীর মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিল না। অবিকৃত অবস্থায় উভয়ে একই বৃন্তে ঝুলিতেছিল। কিন্তু এখন অত্যাচারীর হস্ত ইহা স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া ইহার এইরূপ দশা হইয়াছে।

বড় পীর সাহেবের দোওয়ায় জন্মান্ধ ও খঞ্জ বালকের আরোগ্য লাভ

পীর আবুল হাসান বলিয়াছেন—আমি এবং পীর আলি বেনেল হিতি একদিন হুজুর বড় পীর সাহেবের নিকট বসিয়া ছিলাম, এমন সময় বাগদাদের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আবু গালেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"হে মাহবুবে সোভহানী গওসল আজম! আমার দাদা হজরত রসুলে আকরম (সঃ) বলিয়াছেন—'কোন ব্যক্তি দাওত্ প্রদান করিলে, তাহার দাওত্ কবুল করিতে হইবে।' অতএব আজ আমি হুজুরকে আমার গরীব্খানায় দাওত্ করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আমার দাওত্ কবুল করুন।"

বড় পীর সাহেব সওদাগরের দাওত্ কবুল করিয়া নিজের অশ্বতরের উপর আরোহণ করত সওদাগরের গৃহাভিমুখে চলিলেন, পীর আলি বেনেল-হিতি উহার ডাহিন রেকাব ধরিলেন, আর আমি উহার বাম রেকাব ধরিলাম। আমরা উক্ত সওদাগরের গৃহে উপস্থিত হইয়া তথায় বাগ্দাদের বহু ওলী, পীর, বিদ্বান ও গণ্যমান্য লোককে দেখিতে পাইলাম। তৎপরে আবু গালেব একটী দস্তারখান বিছাইয়া দিলেন, এবং বিবিধ প্রকার উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী তথায় হাজির করিলেন। দুইটী লোক একটী মুখবন্ধ পাত্র আনয়ন করতঃ দস্তারখানের শেষ প্রান্তে স্থাপন করিল। এই সময়ে বড় পীর সাহেব

অধোমস্তকে বসিয়াছিলেন, তিনি নিজে কিছু ভক্ষণ করিলেন না, কিম্বা ভক্ষণ করিতে কাহাকেও অনুমতি দিলেন না, কেহ কিছু ভক্ষণ করিল না, উপস্থিত লোকেরা তাঁহার ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তিনি আমার ও পীর আলি বেনেল-হিতির দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, "উক্ত পাত্রটি আমার সমক্ষে আনয়ন কর।" আমরা উক্ত ভারি পাত্রটী বহন করিয়া তাঁহার সমক্ষে রাখিয়া দিলাম। তিনি আমাদিগকে উহার মুখ খুলিতে আদেশ প্রদান করিলেন, আমরা তাঁহার আদেশ পালন করিয়া দেখি যে, উহার মধ্যে আবুগালেবের একটী জন্মান্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও অবসাঙ্গ পুত্র রহিয়াছে। বড় পীর সাহেব তাহাকে বলিলেন, তুমি আল্লাহ-তায়ালার অনুমতিতে সুস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান হও। শিশুটী তৎক্ষণাৎ ব্যাধিশূন্য অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইল। উপস্থিত লোকেরা তাঁহার এই জ্বলন্ত কারামত দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পীর আবু সাদ কিলাবী এই ব্যাপার শুনিয়া বলিয়াছিলেন, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর পক্ষে ইহা কোন অভিনব বিষয় নহে। তিনি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগগ্রস্থ রোগীকে আরোগ্য এবং মৃতকে জীবিত করিয়া থাকেন।

বড় পীর সাহেবের কারামত দেখিয়া এক দল শিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ

একবার একদল 'শিয়া' বড় পীর সাহেবকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিল। তাহাদের নিকট দুইটী লাউয়ের খোল্ ছিল, উহার মুখ দৃঢ়ভাবে বন্ধ। তাহারা বড় পীর সাহেবকে কহিল—আপনি বলিয়া দিন, ইহার ভিতর কি রহিয়াছে? বড় পীর সাহেব তখন একটীর উপর হস্ত রাখিয়া কহিলেন—ইহার ভিতর একটী খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ শিশু রহিয়াছে। অতঃপর বড় পীর সাহেব, পুত্র শেখ আব্দুর রাজ্জাককে ডাকিয়া কহিলেন—"বাবা, পাত্রটি খুলিয়া দেখত' ইহার ভিতর কি রহিয়াছে?" তিনি উহার মুখের আবরণ খুলিলে দেখা গেল, পাত্রটীর ভিতর একটি অর্দ্ধমৃত খোঁড়া শিশু রহিয়াছে। হজরত বড় পীর সাহেব শিশুর গায়ে ছোট একটী ধাক্কা দিয়া কহিলেন—"ওঠ, দাড়াও"। অমনি সুস্থ ও সবলদেহে শিশুটী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আনন্দে চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। তৎপরে অপর পাত্রটী খোলা হইলে তাহার মধ্যেও আর একটী গলিত কুষ্ঠ এবং বিকলাঙ্গ শিশুকে দেখা গেল। পর পীর সাহেব তাহাকেও ডাকিলেন, সেও সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে বাহির হইল। বড় পীর সাহেব ইহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"যাও—পড়", অমনি ছেলেটী পড়িয়া মারা গেল।

এই দুটী প্রত্যক্ষ কারামত দেখিয়া শিয়া দলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাহারা তখনই তওবা করিয়া হুজুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব।

আকাশে ভ্রমণশীল এক গর্ব্বিত ফকিরের পীরত্ব কাড়িয়া লইবার কাহিনী

পীর মোহাম্মদ হোসায়নি বলিয়াছেন—এক দিবস আমি এবং পীর আলি বেনেল হিতি, বড় পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে যাইতেছিলাম। আমরা হুজুরের বাড়ীর দ্বার দেশে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলাম, তথায় একটী প্রিয়দর্শন যুবক বিষন্ন ও মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদিগকে দেখিয়া সে যেন কেমন উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল, —আপনারা বড় পীর সাহেবের নিকট আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন। সে হুজুরের নিকট কি বিষয়ের সুপারিশ করিতে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, সে সম্বন্ধে মোটেই অবগত না হইয়া আমরা বড় পীর সাহেবকে তাহার বিষয় সুপারিশ করিলাম। বড় পীর সাহেব আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আমি কেবল তোমাদের খাতিরে উক্ত যুবকের অপরাধ ক্ষমা করিলাম। আমরা এই সুসংবাদ যুবকটিকে দিবার জন্য বাহির বাড়ীতে আসিয়া দেখি, সে দহলিজে বসিয়া আছে। আমরা তাহাকে কহিলাম, হুজুর তোমার অপরাধ ক্ষমা

করিয়াছেন। অতঃপর আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম, আমাদের এই কথা শুনিবা মাত্র সে এক লম্ফে গবাক্ষ পথ দিয়া উড়িয়া দূর শূন্যের সহিত মিশিয়া গেল। আমরা বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হইয়া এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারটী হুজুরের কর্ণগোচর করিলাম। তিনি হাসিয়া কহিলেন, এই যুবকটী একজন সিদ্ধ—কামেল হইলেও ভীষণ আত্মগর্ব্বিত। সে মনে করে দুনিয়ায় তাহার তুল্য সিদ্ধ পুরুষ আর নাই, বা হইতে পারে না। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে বাগদাদের উপর দিয়া শূন্য মার্গে উড়িয়া যাইতে যাইতে ঐ কথা ভাবিতে ছিল। সুতরাং এই অহেতুক অহমিকা ভাঙ্গিবার জন্য আমি তাহার বেলায়েত কাড়িয়া লইয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাবতীয় কেরামতীর অবসান হইয়াছিল। তোমাদের সুপারিশ না পাইলে সে কোনও দিন আর তাহার 'বেলায়েত' ফিরিয়া পাইত না।

শূন্য পথে দলে দলে সাধুব্যক্তিদের বাগদাদে আগমন এবং বড় পীর সাহেবের বশ্যতা স্বীকার

পীর আহমদ বাতায়েহি হাদ্দাদী বলিয়াছেন—৫৭৯ হিজরীতে আমি লাব্নান নামক পর্ব্বতে সাধু ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ মানসে উপস্থিত হইলাম। সেই সময় তথায় স্পেহান-বাসী এক জবরদস্ত ওলী থাকিতেন। তিনি দীর্ঘকাল পর্ব্বতে

বাস করিতেছেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "শায়খে জবল্" অর্থাৎ পর্ব্বতের পীর বলিয়া অভিহিত করিত। আমি তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া কহিলাম, হুজুর, আপনি কতকাল পর্ব্বতে রহিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন—"৬০ বৎসর।" আমি তখন আরও জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি এই সময়ের মধ্যে কি কি বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন? শায়খে-জবল কহিলেন—পর্ব্বতের এই উন্মুক্ত আকাশ-তলে বসিয়া খোদার সৃষ্টি রাজ্যে আমি কত যে বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করিয়াছি, তাহার কি কোন হিসাব আছে? সুদীর্ঘ ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ দর্শনে আমি যাহা লাভ করিয়াছি, স্বল্প সময়ে তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না। তবে একটী ঘটনার কথা আমি আপনাকে বলিতেছি। এমন বিস্ময়কর ঘটনা আমি আর দেখি নাই। ৫৯৯ হিজরীর এক পূর্ণিমার রাত্রে আমি দেখিতে পাইলাম, পাহাড়ের অন্যান্য সাধক দরবেশগণ হঠাৎ একস্থানে সমবেত হইলেন এবং পরস্পর কি একটু পরামর্শ করিয়া পাখীর ঝাঁকের মত ইরাকের দিকে সদলে উড়িয়া চলিলেন। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহাদের ভিতরের একজনকে ডাকিয়া কহিলাম—আপনারা কোথায় চলিলেন? তিনি উত্তর দিলেন—হজরত খিজের (আঃ) আমাদিগকে এক্ষুণি বাগদাদে উপনীত হইয়া জামানার কোতব্ এবং পীরানে পীরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাই আমরা যাইতেছি। আমি তখন আরও জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কে? উত্তর হইল—ইনি বাগদাদবাসী শেখ

আব্দুল কাদের জিলানী। আমিও তাঁহাদের সহিত শূন্য পথে চলিলাম। আমরা বাগদাদে পৌছিয়া দেখি, হজরত বড় পীর সাহেব একস্থানে উপবিষ্ট আছেন। বহু বনচারী এবং পর্ব্বতবাসী কামেল দরবেশ পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে তথায় উপস্থিত হইয়া হুজুরের চতুষ্পার্শ্বে অতিশয় আদবের সহিত বসিয়া আছেন। তখনও ঝাঁকে ঝাঁকে দরবেশ আকাশ পথে তথায় আসিতেছিলেন। আমরা দেখিলাম্—হুজুর এক এক দলের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিতেছেন, এবং তাঁহারা পশ্চাৎ হাটিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিতেছেন। অতঃপর তাহারা কিছু দূর যাইয়া শূন্য পথে উড়িয়া চলিলেন। কোন লোকের নিকট এইরূপ অতিরিক্ত বশ্যতা স্বীকার করিবার দৃশ্য আমি জীবনে আর দেখি নাই।

শরিয়ত অমান্যকারী এক কামেল দরবেশের শোচনীয় দুর্গতি

পীর আবুবকর হাম্মানী একজন অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন ফকির ছিলেন। তিনি বাতাসে উড়িতে পারিতেন। পানির উপর হাটিতে পারিবেন। কিন্তু শরিয়তের অনেক রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। সেগুলিকে তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে এড়াইয়া চলিতেন। এই জন্য বড় পীর সাহেব তাঁহাকে বহুবার সতর্ক করিয়া দেন। কিন্তু তিনি সে কথায় আদৌ ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। একদিন বড় পীর সাহেব

রাফাসার জা'মে মসজিদে ঘটনাক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ পান। তখন বড় পীর সাহেব আবুবকরের বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন—"হে আবুবকর তোমার পীরত্ব কাড়িয়া লইলাম।" তখন তাঁহার সমস্ত কারামত এবং আত্মিক শক্তি তিরোহিত হইয়া গেল, অতঃপর তিনি 'করক' নামক স্থানের দিকে প্রস্থান করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পীর আবুবকর যখনই কোন দিন বাগদাদের সীমারেখার মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়াছেন, অমনি অধঃমস্তকে ভূপতিত হইয়াছেন। কেহ তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেও উভয়ের একই দশা হইয়াছে।

পীর আবুবকরের এক বৃদ্ধা মাতা ছিলেন। তিনি পুত্রের জন্য অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এক দিন বড় পীর সাহেবের নিকট আসিয়া কহিলেন—হুজুর, আমি বহুদিন আমার পুত্রকে দেখি নাই। তাহার অদর্শনে আমি অত্যন্ত কাতর রহিয়াছি। আমি কবরের কূলে পা দিয়াছি। হয়তো আর বেশী দিন বাঁচিব না। মরণের পূর্ব্বে আমি পুত্রকে একবার দেখিতে চাই। দয়া করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন। বৃদ্ধার এই কাতর প্রার্থনা শুনিয়া এবং তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া বড় পীর সাহেব কহিলেন—আচ্ছা তুমি বাড়ী যাও, সপ্তাহে একবার করিয়া তোমার ছেলের সাক্ষাৎ পাইবে, তাহার ব্যবস্থা করিলাম। সে জমীর নিম্নদেশ দিয়া করক হইতে বাগদাদে উপস্থিত হইবে, এবং তোমার গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত কুঁয়ার তলদেশে আসিয়া তোমার সহিত কথোপকথন করিবে। কিছুদিন এই ভাবে চলিল, একদিন পীর আদি বিন

মোসাফির, কাজী বোলবানকে হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট পীর আবুবকর সম্পর্কে সুপারিশ করিতে পাঠাইলে বড় পীর সাহেব তাঁহাকে এবিষয়ে আশা প্রদান করেন। পীর মোজাফ্ফরের সহিত পীর আবুবকরের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। পীর মোজাফ্ফর এক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে খোদাকে দর্শন করেন। তখন খোদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে আমার প্রিয় বান্দা! তুমি আমার নিকট কোন কিছু যাচ্ঞা করিতে পার। আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। ইহা শুনিয়া মোজাফ্ফর খোদার নিকট প্রর্থনা করিলেন—হে পরওয়ার দেগার! আমি হৃদয় দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, তুমি আমার ভ্রাতা আবুবকরকে প্রথম অবস্থায় ফিরাইয়া দাও। তখন খোদা কহিলেন—এই ব্যাপার এখন শেখ আব্দুল কাদেরের কর্ত্তৃত্বাধীন রহিয়াছে। তুমি তাহার নিকট যাইয়া বল, "খোদা আবুবকরের প্রতি রাজী হইয়াছেন, তুমিও রাজী হও।" ইহার পর পীর মোজাফ্ফর পুনরায় নবী করিম (সঃ) কে স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ পাইলে নবী করিম (সঃ) তাঁহাকে কহিলেন—হে মোজাফ্ফর! জমিনে আমার প্রতিনিধি শেখ আবদুল কাদেরকে বলিয়া দাও যে, তোমার দাদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে বলিয়াছেন—"তুমি আবুবকরের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া দাও। তুমি আমার শরিয়তের ত্রুটী দেখিয়া তাঁহার উপর শাস্তি বিধান করিয়াছ। আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি—তুমিও ক্ষমা কর।"

প্রভাতে উঠিয়া পীর মোজাফ্ফর এই সুসংবাদ আবুবকরকে দিতে ছুটিলেন। পীর আবুবকরও কাশফ্ শক্তির দ্বারা তাঁহার

এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানিতে পারি বাগদাদের দিকে অসিতেছিলেন, পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। পীরত্ব চলিয়া যাইবার পর পীর আবুবকর এই প্রথম কাশফ্ প্রাপ্ত হইলেন। সাক্ষাৎ লাভের পর দুই বন্ধু বড় পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি পীর আবুবকরকে আনন্দভরে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে তাঁহার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিল, অধিকন্তু তিনি আরও উচ্চ দরজা প্রাপ্ত হইলেন।

লোকে পীর আবুবকরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনি ভূমির তলদেশ হইতে আপনার মাতার সহিত কিভাবে সাক্ষাৎ করিতেন?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন—"আমার মাতার সহিত সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হইলে কোন একপ্রকার বাহন এক সুড়ঙ্গ পথে আমাকে লইয়া যাইত।"

হজরত রসুলোল্লাহর কর্ত্তৃক বড় পীর সাহেবের বেহেশতী লেবাস্ পরিধান

গওসল আজম হজরত বড় পীর সাহেব বলিয়াছেন,—আমি একদিন বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ উর্দ্ধে নজর পড়ায় দেখিতে পাইলাম, শূন্যে মেঘের কোলে হজরত রসুলে করিম (সঃ) একখানি রজত আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে হজরত মুছাও আর একখানি আসনে উপবিষ্ট। তাঁহাদের

পোষাক পরিচ্ছদ, আসন এবং চেহারার বিমল জ্যোতিতে আকাশ মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছে। আমি তন্ময় হইয়া তাঁহাদের পানে চাহিয়া আছি, এমন সময় হজরত রস্থলে করিম (সঃ) আমার দিকে অঙ্গুলি নিদ্দেশ করিয়া হজরত মুছাকে কহিলেন "হে, মুছা ! আপনার উম্মতের মধ্যে ঐরূপ ব্যক্তি কি কেহ আছে ?" হজরত মুছা উত্তর দিলেন—"না, হে আল্লার রস্থল।" অতঃপর হজরত রস্থলে করিম (সঃ) সেই শূন্য হইতে আমাকে আত্মিকভাবে আলিঙ্গন করিলেন, এবং একটী মূল্যবান জামা পরিধান করাইয়া দিয়া কহিলেন— হে আব্দুল কাদের ! তুমি যুগের কোতব্। ইহার নিদর্শন স্বরূপ এই স্বর্গীয় জামাটী পরিধান কর। অতঃপর তিনি আমার মুখে তিনবার তাঁহার পবিত্র থুথু প্রদান করিলেন। ইহাতে আমার বাগ্মিতা আরও বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল।

এক রাত্রির বিস্ময়কর ঘটনা

বাগ্দাদ্বাসী শেখ আবুল্ আহ্সান বিন আসতান্তানা বর্ণনা করিয়াছেন,—আমি বিদ্যাশিক্ষার জন্য বড় পীর সাহেবের মাদ্রাসায় অবস্থান কালে রাত্রিতে প্রায়ই জাগ্রত থাকিয়া হুজুরের খেদমত করিতাম। ৫৫৩ হিজরীর এক গভীর রাত্রে হজরত বড় পীর সাহেব হঠাৎ তাঁহার হুজ্রা শরিফ্ হইতে বাহিরে আসিলেন। অজু করিবার জন্য

তাঁহার পানির দরকার মনে করিয়া আমি তাঁহাকে এক লোটা পানি দিলাম, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। দেখিলাম, হুজুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণের ফটক দিয়া বরাবর বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন, আমিও নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার বহির্গমনের সময়ে দরজা আপনিই খুলিয়া গেল এবং পরে উহা বন্ধ হইল।

কিছুক্ষণ পর হুজুর এক অপরিচিত শহরে উপনীত হইলেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছি। অতঃপর হুজুর একটী 'হুজ্‌রা' গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উহা অবিকল হুজুরের হুজ্‌রাখানারই মত। আমি একটি থামের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া নানা অজ্ঞাত রহস্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, গৃহ খানির ভিতর ছয়জন লোক বসিয়া আছেন, তাঁহারা সম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া হুজুরকে সালাম করিলেন। আমি শুনিতে পাইলাম, গৃহের ভিতর কে যেন অনুচ্চ শব্দে গোঁঙাইতেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে সে শব্দও থামিয়া গেল। অতঃপর সেই কক্ষে আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন এবং অত্যল্পকাল পরে একটী মৃতদেহ বহন করিয়া বাহির হইলেন।

ইত্যবসরে আর এক ব্যক্তিকে ঐ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিলাম। তাহার মাথা কেশশূন্য এবং দীর্ঘ গোঁফ-দাড়ী ছিল। লোকটী হুজুরের সম্মুখে খুবই আদবের সহিত উপবেশন করিল, হুজুর তাহাকে কলমা পড়াইয়া তওবা করাইলেন এবং তাহার গোঁফ কাটিয়া দিয়া মাথায় একটী টুপি

পরাইয়া দিলেন। তাহার নাম রাখা হইল মোহাম্মদ। অতঃপর গৃহের অন্য পাঁচ ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া হুজুর কহিলেন—ইহাকে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত করা হইল। তাঁহারা সকলেই ভক্তিভরে এই কথা সমর্থন করিলেন। অতঃপর হুজুর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহার মাদ্রাসা গৃহে আসিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও দরজা আপনিই খুলিয়া গেল এবং বন্ধ হইল।

প্রভাতে সবক্ পড়িবার সময় আমি রাত্রির ঘটনা সম্পর্কে হুজুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর কহিলেন—তুমি রাত্রিতে যে স্থানে গিয়াছিলে ইহা বাগ্‌দাদের খলিফার অধীন "নেহাওয়ান্দ" নামক একটী শহর, যে ছয়জন লোককে দেখিয়াছ, ইহারা শহরের ছয়জন আব্‌দাল। উহাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শূন্য স্থানে আর একজনকে লওয়া হইয়াছে। যিনি তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন, তিনি কন্‌ষ্টান্টিনেপোলের একজন খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচার ছিলেন, তাঁহাকে তওবা পড়াইয়া মুসলমান করা হইয়াছে। যাহাকে মৃত দেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখিলে, তিনি হজরত খিজির (অঃ)।

বড় পীর সাহেবের দোওয়ার বরকাতে দুইটী পাখীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন

খিজর আল-হোসায়নী বর্ণনা করিয়াছেন—একবার বড় পীর সাহেবের প্রিয়শিষ্য শেখ আবুল হাসান আলী আজ্‌জী পীড়িত হইলে হুজুর তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। শেখ আবুল হাসানের বাড়ীতে একটি পায়রা এবং একটি কুমরী ছিল। পায়রাটি দীর্ঘ দিনের মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে নাই, এবং কুমরীটীও ঠিক অত দিন যাবত ডাকিত না। হুজুরকে ইহা বলা হইলে তিনি পায়রাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"হে পায়রা! ডিম্ব প্রসব করিয়া এবং তাহা হইতে ছানা ফুটাইয়া তোমার প্রভুকে উপকৃত কর।" হুজুর কুমরীটীকেও কহিলেন—"তোমার সুমিষ্ট স্বরে খোদাতায়ালার প্রশংসা কীর্ত্তন কর।" আশ্চর্য্যের বিষয়, পায়রাটী তখনই ডিম্ব প্রসব করিল এবং কিছুদিন পরে তাহা হইতে ছানা বাহির হইল। কুমরীটীও হুজুরের সম্মুখে ডাকিয়া উঠিল। বড় পীর সাহেবের দোওয়ার বরকতে একটী বন্ধ্যা পায়রা ডিম্ব প্রসব করিতেছে এবং একটী নির্ব্বাক কুমরী ডাকিতে শুরু করিয়াছে এই সংবাদ চারিদিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং দলে দলে লোক এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে শেখ আবুল হাসানের বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিল।

বন্যার স্রোতও বড় পীর সাহেবকে তাজিম করে

একবার তাইগ্রিস নদীতে প্রবল বন্যা দেখা দিল। নদীর পানি ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া দুকূল প্লাবিত করিল। আর একটু পানি বৃদ্ধি হইলে বাগ্‌দাদ শহর ভাসাইয়া লইয়া যাইত। শহরের অধিবাসীরা প্রাণভয়ে হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট ছুটিল এবং আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। হুজুর তাহাদের আসন্ন বিপদ বুঝিয়া একখানি ছড়ি হস্তে নদীকূলে গমন করিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় নদীর তীরভূমে যে পর্য্যন্ত জোয়ারের পানি উঠিয়া থাকে, সেখানে হুজুর তাঁহার যষ্টি খানির এক প্রান্ত প্রোথিত করিয়া কহিলেন—"হে বন্যা! এই পর্য্যন্ত থাক, সাবধান ইহার উপরে আর উঠিও না।" বড় পীর সাহেবের এই কথাগুলি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নদীর পানি কমিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ সীমারেখা পর্য্যন্ত নামিয়া গেল। নদীর পানি আর কোন দিন ঐ সীমা অতিক্রম করে নাই।

বড় পীর সাহেবের বদৌলতে দুইটী শুষ্ক খুরমা বৃক্ষের পুনর্জ্জীবন লাভ

পীর ইস্‌মাইল হোমায়রী বলিয়াছেন—জোরায়বান নামক স্থানে আমার একটী উদ্যান-বাটিকা ছিল। ঐ উদ্যানের দুইটী খুরমা বৃক্ষে গত চার বৎসর যাবত মোটেই ফল ধরিত না। বৃক্ষ দুইটী ক্রমশঃ শুকাইতে শুকাইতে প্রায়ই মরণের কূলে দাঁড়াইয়াছিল। একবার পীর আলি বেন হিতি সাংঘাতিক পীড়িত হইলেন। আমার ঐ উদ্যান-বাড়ীর আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর বলিয়া তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শ অনুসারে কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। একদিন হজরত বড় পীর সাহেব পীর আলি বিন হিতিকে দেখিবার জন্য বাগদাদ হইতে আমার ঐ উদ্যান বাড়ীতে আসিলেন। নামাজের সময়ে বড় পীর সাহেব ঐ দুইটী শুষ্ক বৃক্ষের একটীর নিম্নে বসিয়া অজু করিলে উহার মূলদেশ পর্য্যন্ত অজুর পানি প্রবাহিত হইল। তিনি অপর বৃক্ষটীর নিম্নে নামাজ আদায় করিলেন। দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ দুইটী পল্লবিত হইয়া উঠিল। এক সপ্তাহের মধ্যে বৃক্ষ দুইটীতে অতিরিক্ত ফল ধরিল। তখন খুরমার মওসুম ছিলনা। অথচ আমার বৃক্ষ দুইটী ফলে পরিপূর্ণ হইল। সব যেন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল। আমি ঐ বৃক্ষের কিছু খুরমা লইয়া হজরত বড় পীর সাহেবের খেদ্‌মতে উপস্থিত হইলাম এবং উহা

তাঁহার পবিত্র চরণপ্রান্তে উপহার দিলাম। হুজুর উহা খুবই আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া কহিলেন—"খোদা তোমার ভূমি, দেরহম দুগ্ধে এবং পরিমাণে বরকত প্রদান করুন।" অতঃপর আমার জমিতে মামুলী হার অপেক্ষা ঢের বেশীগুণ শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। আমি যখন কোন ব্যবসায়ে একটী দেরহাম খরচ করিতাম, উহাতে কয়েকগুণ বেশী লাভবান হইতাম। একশত 'ছায়া' গোধূমের মধ্যে ৫০ 'ছায়া' দান করিলেও পূর্ব্বের পরিমাণ আদৌ হ্রাস পাইত না। আমার গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যাও অচিরে অসম্ভব বাড়িয়া গেল। আমার এই অবস্থার কোন দিন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

পাঁচটী কবুতরের ভাষায় বহু অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধান

পীর ওস্‌মান সেরিফিন বলিয়াছেন—আমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অবস্থার সূত্রপাত অতি চমকপ্রদ। একদিন রাত্রে আমি সেরিফিনের এক উন্মুক্ত প্রান্তরে শুইয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম, পাঁচটী কবুতর আকাশ পথে উড়িয়া যাইতে যাইতে আমার নিকটস্থ একস্থানে বসিল, এবং পরস্পরে পরিষ্কার ভাষায় কথা বলিতে লাগিল। প্রথম কবুতরটী কহিল—"খোদার নিকট প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রহিয়াছে, তিনি ক্রমশঃ পরিমাণ মত উহা নাজেল করেন,

সুতরাং আমি সেই পরম দাতা ও দয়ালু খোদার তস্‌বিহ পাঠ করিতেছি।" দ্বিতীয় কবুতরটী বলিল—"যে খোদা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্রতা আমি বর্ণনা করিতেছি।" তৃতীয় কবুতরটী কহিল—"যে খোদা লোকদের সৎপথ প্রদর্শনার্থে নবী প্রেরণ করিয়াছেন এবং হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে নবীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, তাঁহার তসবিহ পাঠ করিতেছি।" চতুর্থ কবুতরটী বলিল—"যাহা আল্লাহ ও রসুলের জন্য হয়, তাহা ছাড়া দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় অনর্থক।" পঞ্চম কবুতরটী বলিতেছিল—"প্রতিপালক খোদার এবাদতে উদাসীন থাকা ঘোর অন্যায়। তিনি দানশীল, বহু দান করিয়া থাকেন, তিনি ক্ষমাশীল, বৃহৎ বৃহৎ অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন। সুতরাং তাঁহার এবাদতে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত।"

কবুতরগুলির এই কথোপকথনে আমার অন্তর-রাজ্য এক নিবিড় তন্ময়তায় ছাইয়া ফেলিল। আমি অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িলাম। অতঃপর জাগরিত হইলে অনুভব করিলাম, দুনিয়ার সকল চিন্তা, প্রেম এবং সম্পর্ক আমার মন ও মস্তিষ্ক হইতে তিরোহিত হইয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া আমি অঙ্গীকার করিলাম, আমি এমন একজন পীরের নিকট আত্মসমর্পন করিব, যিনি আমাকে খোদার পথের সন্ধান দিতে পারেন। অতঃপর আমি অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিলাম—আমার সেই বাঞ্ছিত পীরের খোঁজে। কিন্তু কোন্‌পথে কোথায় যাইব, তাহার কোন স্থিরতা নাই। শুধু বিভ্রান্তের মত অলক্ষ্য পথে আমি ছুটিয়া চলিয়াছি।

হঠাৎ পথের একস্থানে আমার অগ্রগমনে বাধা পড়িল। সুসজ্জিত বেশধারী এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"দাঁড়াও ওস্মান।" সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানের তদধিক এক অপরিচিত লোকের মুখে আমার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমি তাঁহাকে অভিবাদন জানাইয়া কহিলাম—হে পথিক! আপনি কে এবং কি ভাবেই বা আমার নাম জানিতে পারিলেন?

পথিক উত্তর করিলেন, আমি খিজির (আঃ)। তুমি যে পীরের খোঁজে বাহির হইয়াছ, আমি তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি এই মাত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর দরবার হইতে আসিতেছি। তিনি বলিলেন, সেরিফিনবাসী ওস্মান নামক এক ব্যক্তি গত রাত্রে জজবা প্রাপ্ত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। সে খোদার নিকট মকবুল হইয়াছে। সাত আসমানের উপরি হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—"হে আমার বান্দা! তুমি ধন্যবাদ গ্রহণ কর।" তুমি তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। পথিমধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইবে।

সহসা আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন এক পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া দেখিলাম, কোথায় সেই খিজির (আঃ), আর কোথায় সেই দিগ্‌হারা মরুপথ, তৎপরিবর্ত্তে আমি বাগদাদে বড় পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর সম্মুখে বসিয়া আছি। হুজুর আমাকে দেখিয়া কহিলেন—"যে ব্যক্তিকে তাহার মালেক পক্ষীর রসনার দ্বারা

আহ্বান করিয়াছেন, তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ।" অতঃপর বড় পীর সাহেব আমার মস্তকে একখানি রুমাল বাঁধিয়া দিলেন। উহার স্নিগ্ধ-শীতলতায় আমার সর্ব্ব শরীর জুড়াইয়া গেল। আমি মাথার তালু হইতে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত বরফের ক্রিয়া অনুভব করিলাম। এই অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ব্যাপার এই যে, আসমানের উপরি হইতে সপ্ততল জামিনের নিম্ন পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুর অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার আমার চক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া গেল। সমস্ত জড় অজড় পদার্থ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির বিভিন্ন ভাষায় তসবিহ পাঠ আমি পরিষ্কার ভাবে শুনিতে লাগিলাম। বাতাসের শন্ শন্ শব্দে, নদী-সাগরের কল্লোলে, মধুমক্ষিকার গুঞ্জনে খোদার প্রশংসা-ধ্বনি আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কবরবাসীদের অবস্থা আমার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি চৈতন্য হারাইতেছিলাম। সহসা হুজুর এক খণ্ড তুলা আমার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মূহূর্ত্তে আমার অভিভূতি ভাব দূর হইল। আমি অতঃপর দীর্ঘ দিন হুজুরের সাহচর্য্যে রহিলাম, এই সময়ে নানা অব্যক্ত ঘটনা আমি দর্শন করিতাম। হুজুর আমার সম্পর্কে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ৩০ বৎসরের মধ্যে একটী একটী করিয়া তাহা সম্পূর্ণ বাস্তব আকারে দেখিতে পাইলাম।

একজন অসঙ্গত দাবীকারীর প্রতি বড় পীর সাহেবের বালিশ নিক্ষেপ

পীর মনসুর পাওয়াস্তি বলিয়াছেন—আমি এক সময় হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট বসিয়াছিলাম। হুজুর তখন একটী বালিশের উপর ভার দিয়া বসিয়া ছিলেন। এমন সময় একটী লোক তাঁহাকে কহিল, হুজুর, এক ব্যক্তি বলিয়া থাকে, বর্ত্তমান কালে সে নাকি অদ্বিতীয় সাধক। কারামত এবং অন্যান্য বিশেষত্বে সে নাকি সকলের শ্রেষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত সে ইহাও বলিয়া থাকে, হজরত ইউনুস (আঃ) না কি হজরত রসুলে আক্‌রম (সঃ) এর দরজা অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া বড় পীর সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া বালিশটী হাতে লইলেন এবং দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—যে এই রূপ অসঙ্গত দাবী করে, তাহার বুকে আমি এই বালিশ ছুড়িয়া মারিলাম।" ইহার পর আমরা কয়েক জন ছুটিলাম সেই লোকটীর বাড়ীর দিকে। যাইয়া দেখি, তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। আমরা জানি, পূর্ব্বে তাহার কোনই পীড়া ছিল না। মৃত্যুর পর আমি এক রাত্রি উক্ত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বেশ আরামে রহিয়াছেন, তাঁহার ভিতর বিষাদের কোন মলিনতা ছিল না। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কিসের জন্য আপনি পরকালে এমন আরামে রহিয়াছেন? তিনি কহিলেন, বড়

পীর সাহেবের দোওয়ার বরকতে আমার এইরূপ সৌভাগ্য-লাভ সম্ভব হইয়াছে। জীবনে আমি রসুলুল্লাহ (সঃ) এর শানে যেরূপ ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছি, হুজুর আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ না করিলে আমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না।

বড় পীর সাহেবের গুণে মুগ্ধ হইয়া একটী জ্বিনের ইস্‌লাম গ্রহণ

গওসল আজম হজরত বড় পীর সাহেব বলিয়াছেন—আমি একরাত্রে 'মনসুরি' জামে মসজিদে একাকী নামাজ পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে বিছানার উপর কিসের চলার শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। আমি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া নামাজ পড়িতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটী বৃহৎ সর্প আমার সিজ্‌দার স্থানে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি ইহাকে হস্তদ্বারা সরাইয়া দিয়া সিজ্‌দা দিলাম। সিজ্‌দা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে সে আবার পূর্ব্বস্থান দখল করিল। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, সে আমাকে দংশন করিবার চেষ্টা করিল না। অতঃপর 'আত্তাহিয়াতো' পড়িবার জন্য কায়দায় বসিলে সে যেন আরও সুযোগ পাইল। সে আমার গলায় বেষ্টনী দিয়া মুখের কাছে দুলিতে লাগিল। আমি অবিচলিতভাবে নামাজ শেষ

করিয়া 'সালাম্' ফিরাইতেই সর্পটীর আর চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরদিবস উক্ত জামে মসজিদের এক ভগ্নস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম, তথায় একটী অদ্ভুত আকৃতির লোক বসিয়া আছে। তাহার চেহারা ও আকৃতির মধ্যে কেমন একটু অভিনবত্ব লক্ষ্য করিলাম। তাহার চোখ দুইটী বিশাল—বিস্ফারিত এবং পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। বুঝিলাম এ-টী জ্বিন্। আমি তাহার নিকটে যাইতেই সে কহিল—"হে গওসল আজম! আমি আপনার কাছে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।" বড়পীর সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে, এবং তোমার অপরাধই বা কি, সত্য পরিচয় দাও। তবেই মার্জ্জনা লাভের আশা করিতে পার।"

লোকটী কহিল—আমি একজন জ্বিন। গত রাত্রিতে নামাজের সময় আপনাকে সর্পের আকৃতিতে অতি অন্যায়ভাবে বিরক্ত করিয়াছি। তাই আজ আপনার নিকট এই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া বড়পীর সাহেব কহিলেন—"ক্ষমা ত তোমাকে পূর্ব্বেই করিয়াছি। নচেৎ আমার মুষ্ট্যাঘাতে তোমার মস্তক তখনই চূর্ণ হইত। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি মতলবে তুমি আমাকে নামাজের মধ্যে ঐরূপ অযথা ত্যক্ত করিতে আসিয়াছিলে?" সে উত্তর করিল, আমি যুগ-যুগান্তর হইতে এই বাসনা মনে পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, কোন একজন শ্রেষ্ঠ মানবের হাতে তওবা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিব। দীর্ঘ দিন ধরিয়া আমি সেই লোককেই খুঁজিয়া

ফিরিতেছি। কত লোককে আমি পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু কাহাকেও মনের মত পাইলাম না। সুখের বিষয়, গত রাত্রিতে আমি আমার সেই ঈপ্সিত জনকে পাইয়াছি। আমি হাজার হাজার ওলী-আল্লাহকে পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু আপনার তুল্য ধৈর্য্যশীল এবং বেপরওয়া আর কাহাকেও পাই নাই। আপনার অদম্য মনের বল, পর্ব্বতের ন্যায় অটল আত্মিকভাব, নামাজে গভীর তন্ময়তা সত্যই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাই আপনার নিকট তওবা করিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। বড়পীর সাহেব তাহাকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

——

এক দার্শনিক যুবকের হস্তে কারামতী কোরআন

পীর মনসুর পওয়াস্তি বলিয়াছেন—আমি যৌবনে দর্শন শাস্ত্রের গবেষণা করিতাম। আহার নিদ্রা ভুলিয়া রাত দিন আমি এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিতাম। বলা বাহুল্য, দর্শন শাস্ত্রের পুস্তকগুলি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। কোন স্থানে গমন করিলে আমার হাতে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতের একখানি পুস্তক থাকিতই। আমি উহা ছাড়িয়া কোথাও যাইতাম না। ঘুমাইলেও আমি উহা হাতে লইয়াই ঘুমাইতাম। মোট কথা—দর্শনশাস্ত্র আমাকে এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, উহাই

ছিল যেন আমার ধ্যান, আমার জ্ঞান, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। কেহ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে আমার অন্তর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম না।

একবার কিসের আকর্ষণে আমি বড় পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুস্তকখানি ছিল। আমি হুজুরের সম্মুখে আসিতেই তিনি আমাকে কহিলেন, "হে মনসুর! তোমার পুস্তকখানি মন্দ সহচর। তুমি উঠিয়া যাও এবং উহা ধুইয়া ফেল।" দুনিয়ার যে কোন কঠোরতা আমি গ্রহণ ও বরণ করিতে পারি, কিন্তু এই বইখানি নষ্ট করা দূরে থাকুক, হাত হইতে কোথাও রাখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। বড়পীর সাহেবের এই কথায় আমার দেহের রক্তকণিকা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন আমি সম্পূর্ণ আপনহারা। ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের ন্যায় বাহ্যিক চেতনা থাকিলেও আমি শক্তিহীন—প্রস্তরবৎ। আমি মনে মনে যুক্তি করিতেছিলাম, এস্থান হইতে একটু সরিতে পারিলেই বইখানি কোথাও লুকাইয়া রাখিব। কিন্তু উঠিবার শক্তি কোথায়? মনে হইতেছিল, হাজার লৌহশৃঙ্খল দিয়া কে যেন আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

অতঃপর বড় পীর সাহেব বইখানি চাহিলেন। আমি উহা তাহার হাতে দিবার সময় খুলিয়া দেখি, বইএর পৃষ্ঠাগুলি একেবারেই সাদা। একটী অক্ষরও তাহাতে নাই। হুজুর কিছুক্ষণ উহা নাড়াচাড়া করিয়া কহিলেন, ইহা মোহাম্মদ বিন জরিসের "ফাজায়েলুল কোরআন"। বেশ সুন্দর কেতাব

এই নেও বাবা তোমার কেতাব। উহা হস্তে লইতেই আমার বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করিল। কোথায় আমার সেই অতি সাধের দর্শন পুস্তক! আর হাতে লইয়া দেখি, সত্যই উহা এবনে জরিসের তফ্সির—"ফাজায়েলুল কোরআন"। ইহার ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি এত মনোরম এবং চকচকে যে, দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। ইহার পর দর্শন এবং ভৌতিক গবেষণা সংক্রান্ত একটী কথাও আমার মনে রহিল না। আমি যেন ঐ বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।"

অতঃপর শেখ মনসুর একজন শ্রেষ্ঠ সাধক এবং পীরের দরজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বড় পীর সাহেবের লাঠি হইতে বৈদ্যুতিক আলোক বাহির

আবদুল্লাহ জাইয়াল বলিয়াছেন—৫৬০ হিজ্রীর কোন একদিন আমি বড় পীর সাহেবের মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পর হুজুর একখানি যষ্টিহস্তে গৃহাভ্যন্তর হইতে আমার পার্শ্ব দিয়া মাদ্রাসায় যাইতেছিলেন। আমি তখন মনে মনে বলিতেছিলাম, হুজুর যদি তাঁহার লাঠিখানির কোন কেরামত দেখাইতেন, তাহা হইলে বেশ হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় আমার নিভৃত মনের এই ধারণা কিভাবে হুজুর যেন জানিতে পারিলেন, তিনি সহাস্যমুখে আমার দিকে দৃকপাত

করিয়া লাঠিখানির একপ্রান্ত ভূমিতে প্রোথিত করিলেন। অমনি উহা উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিল। আমি দেখিতে পাইলাম, যষ্টিখানি হইতে এক শুভ্রোজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ বহির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল আলোকিত করিয়াছে। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিবার পর হুজুর লাঠিখানি গ্রহণ করিলেন। উহা পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া গেল। অতঃপর তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"জাইয়াল! যাহা কামনা করিয়াছিলে তাহা পাইয়াছ ত?"

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক হাবসী-বৃদ্ধার সহিত বড় পীরের সাক্ষাৎ

গওসল আজম হজরত বড় পীর সাহেব বলিয়াছেন—৫০৯ হিজরীতে একবার আমি বাগদাদ হইতে একাকী হজ্ করিতে রওয়ানা হইলাম। আমি তখন তরুণ যুবক। কয়েকদিন সঙ্গিহীনভাবে পথ চলার পর 'ওম্মোল করুণ' নামক স্থানে পীর আদি বিন মোসাফিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মক্কা শরীফে যাইয়া হজ্ করিবার জন্য একাকী বাহির হইয়াছেন। আমরা একই পথের যাত্রী, সুতরাং একত্র রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে বোর্কা পরিহিতা এক হাব্সী-বৃদ্ধার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধা আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া কহিল—হে যুবক! তুমি কে এবং কোথা হইতে

আগমন করিতেছ? আমি উত্তরে কহিলাম—আমি আজম্ দেশবাসী এবং এক্ষণে বাগ্দাদ হইতে আসিতেছি। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা কহিল—তুমি আমাকে বেশ মুশ্কিলে ফেলিয়াছ।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনাকে আমি কী মুশ্কিলে ফেলিলাম?

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া কহিল—মুশ্কিল কি থোড়া! এই বুড়ো বয়সে—এই রোগশীর্ণ শরীর লইয়া আবিসিনিয়া হইতে এখানে আসা কি কম তক্লিফ বাবা। তোমরা জোয়ান মানুষ। বুড়ো মানুষের কষ্ট কি করিয়া বুঝিবে!

আমি কহিলাম—সে তক্লিফ্ আপনি ইচ্ছা করিয়াই লইয়াছেন, সুতরাং আমার অপরাধ কি?

অতঃপর নানা বাদপ্রতিবাদের পর বৃদ্ধা কহিল—আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও আবিসিনিয়ায় ছিলাম। তোমার গুণরাজির কথা খোদার অনুগ্রহে সবই জানিতে পারিয়াছি। বহুদিন হইতে তোমাকে দেখিবার অদম্য বাসনা হৃদয় পোষণ করিয়া আসিতেছি। আমি জীবনের অস্তকূলে উপস্থিত। তাই আজ যখন জানিতে পারিলাম, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, তখন বল, কি করিয়া এই সুযোগ ছাড়ি। অদ্য আমি তোমার সহিত থাকিব এবং একত্রে এফ্তার করিব।"

সন্ধ্যার সময় আমরা এফতারের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম—শূন্য হইতে একখানি খাঞ্চা অবতীর্ণ হইল। তাহাতে ছয় খণ্ড রুটী এবং তদুপযোগী তরি-তরকারী রহিয়াছে। তা ছাড়া কিছু সিরকাও তাহার

সঙ্গে দেখিতে পাইলাম। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধা প্রফুল্লমনে কহিল—খোদা আমার অতিথিদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রশংসা করিতেছি। বৃদ্ধা আরও কহিল, প্রত্যেক রাত্রিতে আমি দুই খানি করিয়া রুটি এবং তদুপযোগী তরকারী পাইয়া থাকি। আজ আমার দুইজন মেহমান আছেন দেখিয়া খোদাও সেই মত খাদ্য পাঠাইয়াছেন। কিছু ক্ষণ পর তিনটি পানিপূর্ণ বদ্‌নাও নাজেল্ হইল। উহাতে যে পানি ছিল, তাহার মিষ্টতা এবং স্বাদ দুনিয়ার পানি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আহারের পর বৃদ্ধা হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমরা তাহার আর খোঁজ পাইলাম না। ইহার পর আমরা মক্কা শরিফে পৌছিলাম। একদিন তওয়াফ্ কালে আমার সঙ্গী পীর আদি বিন্ মোসাফিরের উপর এমন জ্যোতিধারা নাজেল হইল যে, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ হতচেতন হইয়া পড়িয়া যান। আমরা দেখিলাম তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সহসা সেই বোরখা পরিহিতা হাবসী-বৃদ্ধা তাঁহার শিয়রের নিকট দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—যে খোদা তোমাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, তিনিই আবার তোমাকে প্রাণদান করিবেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পীর আদি জীবিত হইয়া উঠিল্লেন।

অতঃপর সেই হাবসী বৃদ্ধা আমাকে কহিল—হে আবদুল কাদের! আমি বুঝিতে পারি না, অদ্য তোমার অবস্থা কিরূপ? তোমার উপর একটী জোতির্ম্ময় তাবু স্থাপন করা হইয়াছে। ফেরেশতাগণ আসমান পর্য্যন্ত তোমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া

আছেন, ওলিগণ নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া তোমার দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন। তুমি যে উন্নত দরজা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার প্রভা আমাকেও পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়াছে। ইহার পর স্ত্রীলোক হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমরা আর তাহাকে কোন দেখি নাই।

বড় পীর সাহেবের আদেশ অমান্য করায় খাদেমের পরিণতি

পীর আহ্‌মদ ও পীর নুরুদ্দীন জিলি বলিয়াছেন—৫৪৬ হিজরীর এক দিবসে আমরা পীর বাকা বিন বতু, পীর আলি বিন হিতি, পীর আবু সাদ কিলাবী এবং পীর মাজেদ কোর্দরী সহ বড় পীর সাহেবের মাদ্রাসায় উপস্থিত হইলাম। হুজুর আমাদিগকে খুবই সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর বড় পীর সাহেব তাঁহার জনৈক খাদেমকে দস্তারখান বিছাইতে আদেশ করিলে খাদেম তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল। কিছুক্ষণ পরে বড় পীর সাহেবের ঈঙ্গিতে খাদেম বহু উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য তথায় হাজির করিল। আমরা উহা খাইতে বসিলাম। বড় পীর সাহেব খাদেমকে আমাদের সহিত খাইতে আদেশ করিলে সে বিনীত-ভাবে কহিল—হুজুর আমি রোজা রাখিয়াছি। বড় পীর সাহেব আবার তাহাকে খাইতে বলিলে সে রোজাদার বলিয়া খাইতে আপত্তি জানাইল। খাদেম যতবার বলিতে লাগিল

আমি রোজা রাখিয়াছি, ততবার বড় পীর সাহেব তাহাকে খাইতে বলিয়া কহিলেন—তুমি ভক্ষণ কর, তুমি সাতটী রোজার সওয়াব্ পাইবে, এক মাসের রোজার সওয়াব্ পাইবে, এক বৎসরের রোজার সাওয়াব্ পাইবে। কিন্তু খাদেম কিছুতেই রোজা ভাঙ্গিয়া খাইতে সাহসী হইল না। অবশেষে বড় পীর সাহেব কহিলেন—তুমি ভক্ষণ কর, সারা জীবন রোজা রাখার ফল পাইবে। এবারও সেই হতভাগ্য খাদেম রোজাদার হওয়ার আপত্তি জানাইল। তখন বড় পীর সাহেব তাহার দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে চাহিতেই সে অজ্ঞান হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল, তাহার সর্ব্বদেহ ফুলিয়া উঠিল, এবং তাহা হইতে অজস্রধারে রক্ত ও পূঁজ নির্গত হইতে লাগিল, আমরা খাদেমের এই চরম দুর্গতি দেখিয়া বড় পীর সাহেবের নিকট তাহার অপরাধ ক্ষমার জন্য সবিনয় প্রার্থনা করিলাম। হুজুর আমাদের প্রার্থনা মতে তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পূর্ণ সুস্থদেহে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিনা অজুতে একব্যক্তি নামাজ পড়ায় বড় পীর সাহেবের সতর্ক বাণী

আবুল ফারাহ বিন হাম্মামী বলিয়াছেন—আমি প্রায়ই হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত থাকিতাম, এবং এমন সব ঘটনা দেখিতাম, যাহা আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির বাহিরে। আমি হুজুরের নিকট ইহার গুপ্ত রহস্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে

তাহা বলিয়া দিতেন। এক দিনের কথা—আমি বিশেষ কার্য্য ব্যাপদেশে বাগ্‌দাদ শহরের এক মহাল্লায় গিয়াছিলাম, তথা হইতে গৃহে ফিরিবার পথে যখন হুজুরের মাদ্রাসার নিকটে আসিলাম, তখন দেখা গেল, আসরের নামাজের জাম্‌য়াত খাড়া হইয়াছে। আমিও তাড়াতাড়ি নামাজে দাঁড়াইয়া গেলাম। আমি যে অজু করি নাই, তাহা আমার আদৌ স্মরণ ছিল না। নামাজ শেষ হইবার পর হুজুর আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—"হে আবুল ফারাহ! তুমি বিনা অজুতে নামাজ পড়িয়াছ। শীঘ্র অজু করিয়া পুনরায় উহা পড়।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

বিদ্যাহীন দরবেশ ডানাহীন পক্ষীর তুল্য

শেখ আব্‌দুল্লাহ জাব্বারী বলিয়াছেন—একদিন আমি "হুলিয়াতুল আওলিয়া" নামক কেতাবখান্নি এবনে নাসেরকে পড়িয়া শুনাইতে ছিলাম। ঐ সময়ে সহসা আমার মনে কি যেন এক অজ্ঞাত ভাবের উদয় হইল। দুনিয়ার মায়া মমতা যেন হঠাৎ আমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। আমি মনে করিলাম—দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া আমি বনচারী হইব, এবং নির্জ্জন সাধনায় কাল কাটাইব। এইজন্য আমি প্রয়োজনীয় উপদেশ লইতে বড় পীর সাহেবের নিকট আসিলাম। বলা বাহুল্য আমি তখন ছাত্র। আমি হুজুরের নিকট আসিতেই নামাজের জাম্‌য়াত খাড়া হইল, আমিও ঐ জাম্‌য়াতে শামিল হইলাম। নামাজের শেষে আমি হুজুরের

সম্মুখে বসিয়া গেলাম। হুজুর আমাকে দেখিয়াই কহিলেন—হে আবদুল্লাহ! মনে রাখিও বিদ্যাহীন দরবেশ, ডানা-পালকহীন পক্ষীর তুল্য, তুমি নির্জ্জনবাসের সঙ্কল্প করিতেছ। কিন্তু তোমার পক্ষে নির্জ্জনবাস আত্মহত্যার তুল্য, তুমি বিদ্যা শিক্ষা কর। কামেল লোকদের সংসর্গে আসিয়া এলমে জাহেরী ও এলমে বাতেনী আয়ত্ত কর, তারপর নির্জ্জনবাস তোমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে। মনে রাখিও, নির্জ্জনবাস গ্রহণকারী একটী উজ্জ্বল আলোকাধারের ন্যায়, লোক পতঙ্গপালের ন্যায় তাহার দিকে ছুটিয়া আসিবে, এবং তাহার নিকট হইতে নানাবিধ কল্যাণজনক প্রেরণা লাভ করিবে। কিন্তু যে নিজে অন্ধকারে রহিয়াছে, অপরকে সে কি করিয়া আলোক প্রদান করিতে পারে?

মোসাফির খানার ছাদ পতন হইতে বহুলোকের প্রাণরক্ষা

শেখ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আবিল সানায়েমী বর্ণনা করিয়াছেন—৫৫৯ হিজরীর মোহার্রম মাসে একদা প্রায় তিন শত ব্যক্তি বড় পীর সাহেবের জিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যে দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া মোসাফির খানায় অপেক্ষা করিতেছিল। হুজুর হঠাৎ ব্যস্ত ত্রস্তভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন—"শীঘ্র করিয়া তোমরা এই ঘরে চলিয়া

আইস।" হুজুরের ডাক শুনিয়াই লোকগুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে মোসাফির খানা ত্যাগ করিতেই উহার ছাদ হঠাৎ পড়িয়া গেল। হুজুর কহিলেন—কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমাকে জানান হইল যে ঘরের ছাদ পড়িতেছে। তাই তোমাদিগকে এমন ত্রস্তভাবে ডাকিয়াছিলাম।

বড় পীর সাহেবের মাথার উপর ধূলী ফেলায় একটী ইঁদুরের শাস্তি

শেখ মোয়াম্মারা জার্রাও বর্ণনা করিয়াছেন—আমি একদিন হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট বসিয়াছিলাম, হুজুর তখন বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কিছু লিখিতেছিলেন। এমন সময় মাথার উপর ছাদ খুঁড়িয়া একটী ইঁদুর হুজুরের উপর তিনবার ধূলী নিক্ষেপ করিল, চতুর্থবার ঐভাবে ধূলী নিক্ষেপ করিলে হুজুর গরম নজরে ইঁদুরটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—তোর মাথা ধূলায় বিলুণ্ঠিত হউক। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম, হুজুরের এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরটী ছিন্ন মস্তকে নিম্নে পড়িয়া গেল। শেখ ওমর বিন মসউদ বর্ণনা করিয়াছেন—একদিন হুজুর অজু করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী উড্ডীয়মান পক্ষী তাঁহার জামার উপর বাহ্য করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া মারা গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

বড় পীর সাহেবের আখ্‌লাক্

মধু পূর্ণিমা-শশীতে কলঙ্ক আছে, বিকশিত বস্‌রাই গোলাপে হয়তো মলিনতা থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষের—মাটীর মানুষের চরিত্র যে কত নির্ম্মল—প্রভাতের শিশির-ভিজা কমলদলের মত নিষ্কলুষ, হয়তো আমাদের সসীম কল্পনা ইহার দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীরে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্যক চিত্র অঙ্কনে অক্ষম।

মাহ্‌বুবে সোভ্‌হানী, কোতবে রব্‌বানী, পীরাণে পীর, গওসে সাকালায়েন হজরত বড় পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর চরিত্র, আচরণ এবং রীতিনীতি সম্পর্কে এই দুর্ব্বল লেখনীতে প্রকাশ করিতে যাওয়া, আর বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে যাওয়া একই কথা। আল্লাহতায়ালা যাঁহাকে নিজের মাহ্‌বুব্ করিয়া পাঠাইয়াছেন, যাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে স্বর্গীয় প্রেরণা, প্রত্যেক চিন্তায় স্বর্গীয় ইঙ্গিত, প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে স্বর্গীয় নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে, বাল্য কিম্বা কৈশোরের জীবন-চঞ্চলতার মধ্যে কোন বিভ্রান্তির আভাষ পাইলে তন্মুহূর্ত্তে স্বর্গীয় সতর্কতা যাঁহাকে অন্যায়ের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাঁহার জীবনের মাহাত্ম্য, চরিত্রের নির্ম্মলতা যে কতদূর থাকিতে পারে, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এই সম্পর্কে পরিচয় দিতে

যাওয়াও ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নহে; তবুও আমরা কর্ত্তব্যের খাতিরে এই সম্পর্কে দুই একটী কথা শুধু এখানে বলিতেছি। সমুদ্রে ডুব দিলে যেমন তাহার নিতলতা—তাহার বিরাট-বিশালতা উপলব্ধি করা যায় না, সীমাহীন দিগন্ত সাহারার বুক হইতে এক মুষ্টি মরু তুলিয়া লইলে যেমন তাহার বিশালত্বের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না, দুই চার কথায় এই বিরাট মহামানবের চরিত্র লইয়া আলোচনা ঠিক তাহাই বৈ আর কিছুই নহে।

শেখ মোয়াম্মার বর্ণনা করিয়াছেন—হজরত বড় পীর সাহেবের তুল্য উন্নত চরিত্র, উদারচেতা, সহৃদয় ও প্রতিশ্রুতি-রক্ষক লোক আমার চক্ষু দ্বিতীয় আর দর্শন করে নাই। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী হইলেও তাঁহার অন্তর শিশুদের ন্যায় সরল ছিল, বালক, বৃদ্ধ, ধনিক, বণিক, দরিদ্র, কাঙাল সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন। বিন্দুমাত্র অহঙ্কার, দ্বিধা সঙ্কোচ কোনদিন তাঁহার বিমল চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রভু ভৃত্যের পার্থক্য তাঁহার মধ্যে আদৌ ছিল না। একজন বালককে দেখিলেও সসম্মানে তাহার অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান হইতেন, স্নেহের বাহু বেষ্টন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন। তিনি পূর্ব্বেই আগন্তককে সালাম করিতেন, তাঁহাকে প্রায়ই কেহ পূর্ব্বে সালাম করিতে পারিত না, বয়োবৃদ্ধগণকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সম্মান করিতেন, ফকির মিসকিন, সাধু দরবেশগণ তাঁহার কাছে অতিরিক্ত সমাদর পাইত। কাহারও প্রাণে

ব্যথাদায়ক বাক্য তিনি কদাচ কোনদিন উচ্চারণ করিতেন না, কাহারও দোষত্রুটী দেখিলে এমন বিনম্র ও মধুর ভাষায় তাহা সংশোধনের জন্য উপদেশ দিতেন যে, সে মোমের ন্যায় গলিয়া যাইত এবং তদ্দণ্ডে তাহার দোষত্রুটী সংশোধন করিয়া লইত। তিনি আমির-ওমরাহ এবং বাদশাহ উজিরের দরবারে যাইতেন না, কিম্বা কাহারও জন্য তাঁহাদের নিকট কোন সুপারিশ করিতেন না। তাঁহার দরবারে খলিফা আগমন করিলে তিনি তাঁহার সম্মানের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন না, অথচ একজন পথের কাঙালও তাঁহার নিকট আসিলে তিনি সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সহিত মোসাফেহা করিতেন।

খাজেব বলিয়াছেন—আমি ১৩ বৎসর হুজুর বড় পীর সাহেবের খেতমতে ছিলাম, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনদিনই তাঁহাকে শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করিতে, কাসিতে কিম্বা গলা খাঁকার দিতে দেখি নাই। মশামাছি তাঁহার শরীরে বসিত না, পিপীলিকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে দংশন করিত না, তিনি জীবনে একবার মাত্র সুলতানের বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বাদশাহ-উজির অথবা বড় লোকের শয্যায় শয়ন করাকে আশু শাস্তি মনে করিতেন। কোন বাদশাহ, নবাব, খলিফা, উজিরকে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিলে, তিনি বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইতেন, তাঁহারা আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে তিনি ভিতর হইতে বাহির হইতেন, যেন তাঁহাদের দেখিয়া অভ্যর্থনার জন্য সসম্মানে দাঁড়াইতে না হয়। তাঁহাদের সহিত রুক্ষ ভাষায় কথা বলিতেন, তাঁহাদের দোষত্রুটীর জন্য

প্রকাশ্যভাবে উপদেশ দিতেন। খলিফার নিকট পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইলে তিনি এইভাবে লিখিতেন—"আবদুল কাদের তোমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছে, তাঁহার আদেশ তোমার মাননীয়। তাঁহার আদেশ-প্রতিপালন তোমার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। তিনি তোমার অগ্রণী।" খলিফা তাঁহার এই ধরণের পত্র পড়িয়া মোটেই বিরক্ত হইতেন না, বরং সৌভাগ্যের উপাদান স্বরূপ উহা সযত্নে চুম্বন করতঃ তুলিয়া রাখিতেন।

আবু আবদুল্লাহ বাগ্‌দাদী বলিয়াছেন—বড় পীর সাহেব অধিকাংশ সময়ে অশ্রু বর্ষণ করিতেন, তাঁহার পবিত্র গণ্ড বাহিয়া মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িত। তাঁহার চেহারার মধ্যে এমন এক গাম্ভীর্য্য ছিল যে, লোকে বেশীক্ষণ সেদিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিত না, তাঁহার মুখের পানে চাহিলে কি এক অজ্ঞাত ত্রাসে বুক কাঁপিয়া উঠিত, অতি পাষাণ হৃদয়ও তাঁহার নিকট বশীভূত হইত। তাঁহার ঘর্ম্ম সৌরভিত ছিল। তিনি ভুলিয়াও কোনদিন কুবাক্য মুখে আনিতেন না। কুপিত হইলেও তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইত না। নিজের ক্ষতিতে তিনি কাহারও প্রতি রূঢ় শব্দ ব্যবহার করিতেন না, তবে কাহাকেও খোদার আদেশ লঙ্ঘন করিতে দেখিতে তিনি ভীষণ চটিয়া যাইতেন। তিনি ভিক্ষুককে কোনদিন নিরাশ করিতেন না।

বড় পীর সাহেব সত্যই গরীবের বন্ধু—অসহায়ের সহায় ছিলেন। তিনি কতভাবে কত দীন দুঃখীর উপকার করিয়াছেন, কত ব্যথিতের নয়নাশ্রু মুছাইয়াছেন, কত বিপন্নের উদ্ধার-

সাধন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। পরের দুঃখ দেখিলে তিনি অধীর হইয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার কোন দিকেই লক্ষ্য থাকিত না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দুঃখ ঘুচাইতে না পারিতেন, ততক্ষণ তাহার 'বে-চায়নী' দূর হইত না। প্রত্যহ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি প্রতিবেশীদের মধ্যে আর্ত্ত-পীড়িতগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের খোঁজ খবর লইতেন, পীড়ায় প্রবোধ এবং শোকে সান্ত্বনা দিতেন। আত্মীয়স্বজন বা দূর সম্পর্কের কেহ মরিয়া গেলে তাহার দাফন-কাফন, গোসল ইত্যাদিতে অন্যের সহিত সমান পরিশ্রম করিতেন। কেহ বিপন্ন হইলে প্রাণ দিয়া তাহার সাহায্য করিতেন।

বড় পীর সাহেব কিভাবে বিপন্নের সাহায্য করিতেন তাহার একটী দৃষ্টান্ত

একবার বড় পীর সাহেব দেখিতে পাইলেন, এক ভগ্ন-হৃদয় দরিদ্র ব্যক্তি মলিন মুখে পথিপার্শ্বে বসিয়া আছে, তাহার এই অবস্থা দেখিয়া হুজুর কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কি হইয়াছে ভাই, এমন মলিন মুখে বসিয়া আছ কেন? লোকটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল—হুজুর! আমি অতি অভাগা। বিশেষ কার্য্যে আমাকে নদীর ওপারে যাইবার প্রয়োজন হয়, আমার নিকট পয়সা-কড়ি নাই, তাই পারানী দিতে না পারায় খেয়ার মাঝী আমাকে নৌকা

হইতে নামাইয়া দিয়াছে। এখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া আমি এখানে বসিয়া আছি। লোকটীর বিষাদমাখা আত্মকাহিনী শুনিয়া দয়ার সাগর বড় পীর সাহেবের দয়ার সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার প্রতিকারের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একব্যক্তি আসিয়া ৩০টী স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়া তাঁহাকে উপহার দিল। বড় পীর সাহেব তখনই পরম হর্ষে থলিয়াটী বিপন্ন লোকটীর হাতে দিয়া কহিলেন—"এই নাও ভাই, থলিয়াটী খেয়ার মাঝীকে দিয়া বলিও, সে যেন আর কোনদিন কোন গরীবের নিকট হইতে পারানী দাবী না করে।" অতঃপর বড় পীর সাহেব লোকটীকে আরও নিজের একমাত্র পরিধেয় জামাটী দিয়া দিলেন এবং ২০টী মুদ্রা দিয়া আবার তাহার নিকট হইতে উহা কিনিয়া লইলেন।

বড় পীর সাহেব বাজারে বহু ময়দা ও রুটী বিক্রেতাকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, কোন গরীব-কাঙাল পয়সা অভাবে ময়দা বা রুটী ক্রয় করিতে না পারিলে তাহাদিগকে ঐ সমস্ত জিনিষ যেন বিনামূল্যে দেওয়া হয়, পরে হুজুর নিজ তহবিল হইতে উহার মূল্য দিয়া দিতেন। হুজুরের এই উদার-ব্যবস্থায় শহরের প্রায় কোনও ফকির-মিসকিন অভুক্ত থাকিত না। কোন ব্যক্তি উপঢৌকন স্বরূপ তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রা ইত্যাদি দিতে আসিলে তিনি উহা স্পর্শ না করিয়া কহিতেন—"ইহা জায়নামাজের নিম্নে রাখিয়া দাও।" অতঃপর খাদেমকে বলিতেন—"তুমি এইগুলি অমুক রুটী ও ময়দা বিক্রেতাকে দিয়া আইস।" খলিফার নিকট হইতে কোন মূল্যবান বস্ত্র কিংবা দ্রব্য উপঢৌকন আসিলে বড়

পীর সাহেব তাহা তদ্দণ্ডে বাজারের দোকানদারগণের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তাহারা ইহার বিনিময় গরীব ও ভিখারী-দিগকে বস্ত্র কিম্বা আহার্য্য প্রদান করিত।

এতদ্ব্যতীত গরীব পরওয়ার বড় পীর সাহেবের গোপনদান যে কত ছিল তাহার সত্যই পরিমাণ করা যায় না।

বড় পীর সাহেবের খের্কা প্রাপ্তি

'খেরকা' পীরত্ব-প্রাপ্তির এক সার্টিফিকেট বিশেষ। ইহারই উপর পীরের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। যিনি যত বড় সাধুপুরুষের নিকট হইতে খেরকা পাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তত সুমহান গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। বড় পীর সাহেবের খেরকা প্রাপ্তির ধারাবাহিক তালিকা নিম্নরূপ—একে অপর হইতে পরপর খেরকা পরিধান করিয়াছিলেন।

১। গওসল আজম হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)।
২। পীর আবু সাইদ মখজুমী।
৩। „ আবুল হাসান কারশী।
৪। „ আবুল ফারাজ তরতুসী।
৫। „ আবুল ফজল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী।
৬। „ আবুবকর শিব্লী।
৭। „ জোনায়েদ বাগদাদী।
৮। „ সর্রি সাকৃতি।

৯। পীর মারুফ কার্‌খী।

১০। „ দাউদ তায়ী।

১১। „ হবিবে আজমী।

১২। „ হজরত হাসান বাসারী।

১৩। খলিফাতুল মুস্‌লেমিন শেরে-খোদা হজরত আলী মোর্ত্তজা (রঃ)।

১৪। সৈয়েদুল মোরসালিন খাতেমুন্নাবিঈন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আহমদে মোজতবা সল্লোল্লাহো আলায় অ-সাল্লাম।

বড় পীর সাহেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বহু ওলী-আল্লাহ কর্ত্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী

শেখ আবুবকর বিন হাওয়ার একদিবস তাঁহার শিষ্যগণের সমক্ষে ওলী-আল্লাহদের জীবনী লইয়া আলোচনা করিতে করিতে কহিলেন—অচিরে এরাক প্রদেশে এক বিশিষ্ট আজমী পীরের আবির্ভাব হইবে। তাঁহার ন্যায় উন্নত মর্য্যাদাধারী পীর আসমান ও জামিনের মাঝে আর হয় নাই এবং কোন দিন হইবেও না। তিনি বাগদাদের অধিবাসী হইবেন। সমস্ত ওলী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাকে গৌরবজনক মনে করিবেন।

পীর আবু আহমদ আবতুল্লাহ জুন্নি ৪৬৮ হিজরীতে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—শীঘ্র আজম দেশে এক পরম ভাগ্যবান শিশু জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাবলীতে দেশ মুগ্ধ হইবে। তিনি এমন অদ্বিতীয় পীর রূপে আবির্ভূত হইবেন যে, তৎকালে সমগ্র ওলী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবেন। তিনি বিজয় দম্ভে ঘোষণা করিবেন —"আমার কদম প্রত্যেক ওলীর গ্রীবা দেশে।"

বাগদাদ শরীফে অধ্যয়ন কালে বড় পীর সাহেব প্রায়ই তৎকালীন নামজাদা পীর হাম্মাদের নিকট যাইতেন। বড় পীর সাহেব তথা হইতে চলিয়া আসিলে পীর হাম্মাদ লোকদিগকে কহিতেন—"তোমরা এই বালকটীকে চিনিয়া রাখ, ইনি অচিরে একজন বিশ্বশ্রেষ্ঠ পীর রূপে বাগদাদের মাটী ধন্য করিবেন।"

বড় পীর সাহেবের স্বনামধন্য ওস্তাদ বাগদাদের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পীর আবুল ওফা কাকিস (রঃ) বলিয়াছেন—আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, আমাদের ছাত্র আবতুল কাদের জিলানী যেন ঘোষণা করিতেছেন "আমার কদম প্রত্যেক ওলীর গ্রীবাদেশে" আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত ওলী ঘাড় নত করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন। তোমরা এই যুবকটীকে দেখিলে সসম্মানে দণ্ডায়মান হইবে। কারণ খোদার ওলীর জন্য দণ্ডায়মান না হওয়া অন্যায়।

বড় পীর সাহেবের পাঠ্য জীবনের একটী বিস্ময়কর ঘটনা

দামেশকবাসী আবু সাঈদ আবতুল্লাহ তামিমী বর্ণনা করিয়াছেন—বাগদাদস্থ নেজামিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে আমি শেখ আবতুল কাদের এবং এবনোস সাক্কা নামে আমাদের এক সহপাঠীকে লইয়া একদিন এক গওসকে পরীক্ষা করিবার জন্ত বাহির হইলাম। তিনি সেই সময়ে বাগ্‌দাদে অবস্থান করিতেন! তাঁহার সম্বন্ধে আমরা নানা অলৌকিক কাহিনী শুনিতাম। তিনি যখন ইচ্ছা প্রকাশিত হইতেন, আবার কোথায় সহসা লুকাইতেন। কখন তাঁহাকে লোকে পানির উপর ভ্রমণ করিতে দেখিত, আবার পর মুহূর্ত্তে দেখা যাইত তিনি শূন্তে বিচরণ করিতেছেন। আমরা তিনবন্ধু তাঁহার সাক্ষাৎলাভের জন্য রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে এবনোস সাক্কা কহিলেন, আমি গওস সাহেবকে এমন এক জটীল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যাহার উত্তর দিতে তাঁহার কেরামতিতে কুলাইবে না। আমি বলিলাম—আমিও ঐ ধরণের এক প্রশ্ন মনে মনে ঠাওর করিয়া রাখিয়াছি। হাজার বৎসর চিন্তা করিলেও তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। শেখ আবতুল কাদের (রঃ) কহিলেন—আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বরকত হাসেল করিব, নিছক এই উদ্দেশ্য লইয়া যাইতেছি। সুতরাং তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আস্পর্দ্ধা রাখি না।

অতঃপর আমরা গওস সাহেবের আস্তানায় উপস্থিত হইয়া দেখি, তাঁহার আসন শূন্য। আবার নিমেষের মধ্যে দেখিতে পাইলাম তিনি স্বীয় স্থানে উপবিষ্ট। তিনি এবনোস সাক্কার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন—হে এবনোস সাক্কা! তোমার প্রতি ধিক্। তুমি আমার নিকট এই প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলে, তার উত্তর এই। তুমি বলিয়াছিলে—আমি নাকি উহার উত্তর দিতে সমর্থ হইব না? এখন উত্তর শুনিলে ত! আমি দেখিতেছি কাফেরী অগ্নি তোমার মধ্যে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। অতঃপর গওস সাহেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—হে আবতুল্লাহ! তুমিও আমার কাছে এমন প্রশ্ন করিতে আসিয়াছ, যাহার উত্তর আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার এই ধারণা ভ্রান্ত। তোমার প্রশ্ন এই—এবং তাহার উত্তর এই। তুমি আমার প্রতি বিশেষ অবজ্ঞা দেখাইয়াছ, ইহার জন্য তোমাকে চরম ফল ভোগ করিতে হইবে। তুনিয়া তোমাকে গিলিয়া ধরিবে। তুমি পার্থিব ভোগ-লালসার ক্রীতদাস হইয়া জীবন কাটাইবে। অতঃপর গওস সাহেব শেখ আবতুল কাদেরের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বাবা! তুমি যে আদব রক্ষা করিয়াছ, যে শিষ্টাচার দেখাইয়াছ, তজ্জন্য নিশ্চয় তুমি আল্লাহ ও রসুলকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। আমিও তোমার সৌজন্য এবং সৎ-আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমি যেন মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেছি—তুমি বাগদাদের এক সুমহান আসনে বসিয়া ঘোষণা করিতেছ "আমার কদম প্রত্যেক ওলীর গ্রীবাদেশে" আর যুগের সমস্ত

ওলী গ্রীবাদেশ নত করিয়া তোমার ঐ ঘোষণা সমর্থন করিতেছে।" এইটুকু বলিবার পর আমরা চাহিয়া দেখি গওস্ তথায় আর নাই। হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহাকে আমরা আর কোনদিন দেখি নাই।

আর এক জন বর্ণনাকারীর বিবৃতিতে প্রকাশ, গওসের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গিয়াছিল। এবনোস সাক্কা কৃতী ছাত্ররূপে বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইলেন। বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি নানাশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তর্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য তখন আর কেহ ছিল না। তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং গুণ গরিমার পরিচয় পাইয়া খলিফা তাঁহাকে এক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর তিনি পররাষ্ট্র সচিবের পদলাভ করিয়া কনষ্টান্টিনোপলে চলিয়া যান। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কন্ষ্টান্টিনোপল এক খৃষ্টান রাজার অধীন ছিল। তিনিও এবনোস সাক্কাকে কৃতবিদ্য এবং চরিত্রবান্ মনে করিয়া খুবই সমাদর করিতেন।

একদিন রাজার প্রাসাদে "ইস্লাম ও খৃষ্ট ধর্ম্ম" সম্পর্কে এক আলোচনা ও তর্কবৈঠক বসে। রাজা দেশের বাছা বাছা পাদরীদিগকে তথায় আহ্বান করেন। মুস্লিম দলের মুখপাত্ররূপে দণ্ডায়মান হন—এবনোস্ সাক্কা। তিনি এমন অকাট্য যুক্তি তর্কের দ্বারা ইসলামের মহাত্ম্য বর্ণনা করেন যে, পাদরীগণ একটী কথাও বলিবার সাহস পায় না। রাজা, এবনোস সাক্কার অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া এমনই মুগ্ধ হন

যে, তিনি স্থানকাল ভুলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। অতঃপর রাজার আদেশে রাজ-প্রাসাদের দ্বার তাঁহার জন্য অবারিত হইল।

হঠাৎ আর এক ঘটনা ঘটিয়া গেল। রাজার এক পরমা-সুন্দরী কুমারী কন্যাকে দেখিয়া এবনোস সাক্কা তাঁহার প্রেমে পড়িলেন। একজন অটুট স্বাস্থ্যবান এবং প্রিয়দর্শন যুবককে দেখিয়া রাজ-দুহিতাও মজিলেন। উভয় পরস্পরে প্রতি অনুরক্ত—উভয়ই উদ্‌ভ্রান্ত। বিবাহের প্রস্তাব গেল রাজার নিকট। যোগ্য পাত্র হইলেও তিনি মুসলমান যুবককে কন্যাদানে সম্মত হইলেন না। অবশেষে প্রেমেরই জয় হইল। এবনোস্ সাক্কা খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন—ইহা সে গওসের অভিশাপের ফল। আবদুল্লাহও এক বিপুল অকৃফ সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া দুনিয়াদারীতে সম্পূর্ণ ডুবিয়া রহিলেন। শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) সম্পর্কে এখানে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

দশম পরিচ্ছেদ

বড় পীর সাহেবের চিন্তাধারা

হজরত বড় পীর সাহেবের জীবন ছিল এক—আদর্শ জীবন। তাই এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে এক অনাবিল আদর্শ পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন। অসংখ্য শিষ্যগণকে উপদেশ দান, সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন, এবাদত রেয়াজাত, বিভিন্ন মুস্‌লিম জগৎ হইতে প্রেরিত ফত্‌ওয়ার উত্তর প্রদান ইত্যাদিতে তাঁহার কর্ম্ম-বিপুল মুহূর্ত্তগুলি কাটিলেও তিনি যে সল্পসময় টুকু পাইতেন, তাহা আয়েশ আরামে ব্যয় করিতেন না। মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা লিখিত উপদেশের যে স্থায়ীত্ব অধিক, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন।

কথিত আছে, বড় পীর সাহেবের মহফিলে চারিশত দোয়াত মওজুদ থাকিত, এবং বহু শক্তিশালী লেখক সর্ব্বদা তাঁহার সহিত থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা, উপদেশ, রচনাবলী এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেন। কখনও 'তিনি বলিয়া যাইতেন অপরে তাহা লিখিয়া রাখিত, কখনও নিজেও লিখিতেন। এই ভাবে তাঁহার বহু উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়া তাহা কেতাব আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার এক এক খানি কেতাব মুস্‌লিম জগতের এক একটী বিরাট

সম্পদ। কি অপূর্ব্ব চিন্তাধারা, মূল্যবান উপদেশ এই সব কেতাবের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশের মত ভাষা নাই। মুসলমানের ব্যবহারিক জীবনে যাহা কিছুরই প্রয়োজন—তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তার কিছুই বাদ যায় নাই। বড় পীর সাহেবের 'মকতুবাত্' না পড়িলে প্রকৃত তাসাওফের কিছুই জানা যায় না। তাঁর কবিত্ব শক্তিও যে অসীম ছিল, তাহা আমরা তাঁহার কতিপয় কাব্য গ্রন্থ পাঠে পরিচয় পাই। আমরা এখানে তাঁহার সঙ্কলিত কয়েকখানি অমূল্য কেতাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহৃদয় পাঠকবর্গের সম্মুখে পেশ করিতেছি।

১। **ফতুহল গায়েব্**—সুফীবাদ এবং মারেফাত্ সম্পর্কে এক খানি বিরাট উপাদেয় গ্রন্থ। বিভিন্ন বিষয় লইয়া বড় পীর সাহেবের ৭৮ টী বক্তৃতা হইতে স্থান পাইয়াছে—এক একটা মারেফাতের এক একটী খনি। ইহা পড়িতে পড়িতে সাধারণ মানুষের চিন্তা শক্তি স্তব্ধ হইয়া আসে। প্রেমাস্পদের দিকে মন ছুটিয়া যায়।

২। **গুনিয়াতুত্তালেবিন**—বড় পীর সাহেবের সঙ্কলনের মধ্যে এই খানি সবচেয়ে মূল্যবান এবং বিরাট গ্রন্থ। বিশ্ব মুসলমানের কাছে গুলিয়াতুত্তালেবিন একটী সম্পদ। আহলে সুন্নাতুল জাময়াতের সঠিক পথ এবং মত কি, হানাফী মতের প্রকৃত নির্দ্দেশ ও বিধান কি, অন্যান্য এমামদের সহিত হানাফী এমামের বিরোধ এবং মতের অসামঞ্জস্য কোথায়, উপযুক্ত দালীল প্রমাণের দ্বারা বিরুদ্ধপন্থীদের ভ্রান্ত মতের খণ্ডন, ৭৩ ফেরকার মধ্যে কোন্ ফেরকা সত্যপথের উপর প্রতিষ্ঠিত,

ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়, ইহাতে আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, বিভিন্ন চাঁদের নফল রোজা ও নফল নামাজের ধারা প্রদ্ধতি, বিভিন্ন দোওয়া কালামের ফজিলত এই কেতাবের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। মোট কথা 'গুনিয়াতুত্তালেবিন' মুসলিম জীবনের একখানি চিরস্থায়ী দিনপঞ্জী—মুসলমানের নানা সমস্যার শেষ সিদ্ধান্ত —মুসলমানের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের বেহেশ্‌তী 'খাজিনা'। 'তালেব'-এর যা কিছু চাওয়া, এর ভিতর তার কিছুই কমি নাই।

এতদ্ব্যতীত "ফতুহর রাব্বানী" "কাসিদাতুল গাওসিয়া" প্রভৃতি তাঁহার আরও বহু মূল্যবান কেতাব্‌ রহিয়াছে, ইহাও এক এক খানি, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সোপান—মারেফাতের পূর্ণ বিকাশ।

গওসল্‌ আজম হজরত বড় পীর সাহেবের উপদেশাবলী

হজরত বড় পীর সাহেব তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কতভাবে যে কত অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার এক একটী উপদেশ যেন এক একটী মণি-মুক্তার খনি। ইহা ব্যথা-বেদনায় শান্তির প্রলেপ, দুঃখ-বিপদে সান্ত্বনা। তাঁহার ঐ সব অমূল্য উপদেশ অনুসরণ

ও পালন করিয়া চলিলে মানুষের কোনই দুঃখ থাকিতে পারে না। এমন কি ইহার দ্বারা মানুষ জীবনের অনাবিল পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ইহকাল ও পরকালের অশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষের যে সব দূর্ব্বলতা রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার পক্ষে হজরত বড় পীর সাহেবের উপদেশ অমোঘ দাওয়াই। আমরা তাঁহার কতিপয় মূল্যবান্ উপদেশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি—

তুমি আর সে

তোমরা সর্ব্বদা নিজেকে অপর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধারণা করিবে। তোমরা অল্প বয়স্কদের নিকট গেলে মনে করিবে, আমাদের চেয়ে ইহারা ভাল। কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের গোনাহও বৃদ্ধি হইয়াছে, আর ইহাদের বয়স কম বলিয়া গোনাহও কম হইয়াছে। যুবকেরা বৃদ্ধদের দলে মিশিলে মনে করিবে—ইহারা আমাদের অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। কারণ ইহাদের বয়োবৃদ্ধির সহিতও জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে, তা ছাড়া অনেক পুণ্য কার্য্য করিবার সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছেন, বয়স অল্পের কারণে আমাদের দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। অশিক্ষিত লোক পণ্ডিতদের নিকট গেলে মনে মনে বলিবে—ইহারা আমাদের চাইতে কত ভাল। আমরা অশিক্ষিত, ভালমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা অন্ধকারে থাকিয়া খোদাকে খুঁজিতেছি, আর

ইহারা শিক্ষিত, জ্ঞানের আলোক ইহাদের দেহের মণি-কোঠায় প্রজ্জলিত। আবার শিক্ষিত লোক যখন অশিক্ষিত লোকের সহিত মিশিবে, তখন মনে মনে বলিবে—ইহারা অশিক্ষিত হইলেও আমাদের অপেক্ষা ভাল, কারণ শিক্ষার আলোকে জানিয়া শুনিয়া আমরা অন্যায় করিতেছি, সুতরাং খোদার নিকট ক্ষমা প্রাপ্তির আশা নিতান্ত বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং ইহাদের অজ্ঞানকৃত ত্রুটী খোদা ক্ষমা করিবেন।”

কোন্ পথে তোমার সফলতা

মারেফাতের আলোকে খোদাকে দেখিতে চাও? তা হইলে প্রবৃত্তিকে হত্যা কর, পার্থিব বন্ধন মন হইতে মুছিয়া ফেল। মানুষের আঘাত যখন তোমাকে পীড়া দিতে পারিবে না, মানুষের দুর্ণামে যখন তুমি বিচলিত হইবে না, মানুষের প্রশংসাবাদে যখন তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না, মানুষের অনিষ্টে যখন তুমি মোটেই ব্যথিত হইবে না, কিংবা মানুষের উপকারে তোমার চিত্তকে হর্ষোৎফুল্ল করিয়া তুলিবে না, তখনই তুমি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, তখনই তোমার মানব জীবন সফল।

মানব জীবনের সার্থকতা

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ। ফেরেশতাও খোদার সৃষ্টি। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য—প্রবৃত্তি নিচয়, ইহা না থাকিলে মানুষ ফেরেশতা হইয়া যাইত। প্রবৃত্তিকে জয় করিতে পারিলে মানুষের মর্য্যাদা ফেরেশতাদের চেয়ে বেশী হয়। মানুষ খোদা

তায়ালার যে কি সাধের সৃষ্টি, তাহা একমাত্র খোদাই জানেন। মানুষ সৃষ্টি এক অট্টালিকা বিশেষ। ইহাতে একাধারে আলো-আঁধার বিরাজিত। "আমি মানুষকে সম্মানিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি"—আল্লাহর এই বাণীর দ্বারা তাহাদিগকে অত্যাধিক বোজর্গী দান করা হইয়াছে। তাহার আকৃতি প্রকৃতি, তাহার সৌন্দর্য্য সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অদ্ভুত। মাটীর দেহ রুহের মোতিমালায় সমুদ্ভাসিত করা হইয়াছে।

মানুষের মনে দুইটী প্রবল শত্রু অহর্নিশ দ্বন্ধে রত। এক দিকে বিবেক বাহিনী—অন্য দিকে কুপ্রবৃত্তি বাহিনী। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক এই প্রতিকূল সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্র। বিবেক বাহিনীর সেনাপতি রুহ বা আত্মা আর প্রবৃত্তি বাহিনীর পরিচালক নাফ্ছ বা রিপু। প্রবল বিক্রমে এই দুই বাহিনী যখন বিপরীত দিক হইতে অগ্রসর হইতে থাকে তখন দৈববাণী ঘোষিত হয়—বিবেক! বীরত্বের সহিত অগ্রসর হও। অতঃপর দুই দলে প্রলয় সংগ্রাম বাধিয়া যায়। তখন খোদা উভয় দলকে শুনাইয়া দেন, "যুদ্ধে তাহারাই জয়ী হইবে, যাহাদের মদদ্গার স্বয়ং আমি, যে বাহিনীর পরিচালনা আমিই করিয়া থাকি। মনে রাখিও আমি যার মদদ্গার, আমি যার পরিচালক, আমি যার হামী তার কোন প্রকার দুর্ভোগ নাই।" তাই বলি, সর্ব্বদা জ্ঞান ও বিবেকের তাবেদারী করিবে। নাফছের আব্দার কখনও রক্ষা করিবে না। মনে রাখিও তোমার মানসিক আঁধার জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করিতে হইবে।

সৎকার্য্যের প্রবৃত্তি

খোদাকে ভয় করিয়া সরল বিশ্বাসের সহিত যে ব্যক্তি পরহেজগারী অবলম্বন করিয়াছে, সে তুনিয়ার অন্য সব কিছুর উপর বিরক্ত, মাহ্‌বুবই তাহার একমাত্র লক্ষ্য—ধ্যান ধারণা।

তোমরা এমন কোন বিষয়ের দাবী করিও না, যাহা তোমরা পাইবার যোগ্য নহ। তোমাদের কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি হইলে বিচলিত হইও না। ধৈর্য্য ধারণ কর, খোদার নিকট হইতে অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করিবে।

নাফছের উত্তেজনা যতদিন না মিটিবে, ততদিন দেহের গ্লানি দূর হইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুষ্ট নাফছ "আস্‌হাবে কাহাফ"এর কুকুরটির মত খোদার সন্তুষ্টির দরওয়াজায় না বসিবে, ততদিন তোমার অন্তঃকরণ নিরাপদ নহে। পাপরূপ দস্যুর সেখানে ঢুকিবার আশঙ্কা সর্ব্বক্ষণ রহিয়াছে। যাহার নাক্‌ছ বশীভূত, তাহার চক্ষের সম্মুখে এক অভিনব জগতের দ্বার খুলিয়া যায়, সে কাণে শুনিবে নানা রহস্যময় ধ্বনি। তাহার স্পর্শে অসাড় প্রাণও পুলকে নাচিয়া উঠিবে। পথ ভ্রান্ত তাহার ইঙ্গিতে লাভ করিবে সত্যপথের আলোক-বর্ত্তিকা। হতভাগ্য তার সংসর্গে আসিলে ভাগ্যবান হইবে।

ওলীগণ 'আব্দাল' গণের ভৃত্য, আব্দালগণ নবীদের ভৃত্য এবং নবীগণ রসুলে করিম (সঃ) এর ভৃত্য। ওলিগণ বাদশাহী দরবারে মোসাহেবের তুল্য। ওলিদের একটী রজনী একটী রাজত্ব বিশেষ, দিন তাঁহাদের পক্ষে খোদার নৈকট্য লাভের সেতু তুল্য। সমস্ত দিন আকুল প্রতীক্ষার পর

রজনীর অন্ধকারে তাঁহারা মাহবুবের মিলন-বাসরে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সরলতা বিশ্বাস ও সত্যবাদিতা

ন্যায়নীতি এবং সত্যবাদিতা জীবনের শ্রেষ্ঠ করণীয় মনে করিও, এই দুইটীর অভাবে মানুষ কোন দিন খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। হজরত মুছা যেমন প্রস্তরের উপর যষ্টি আঘাত করায় তাহা হইতে উৎস ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তুমিও সেরূপ বিশ্বাস ও সত্যবাদিতার যষ্টি দিয়া তোমার প্রস্তর-কঠোর হৃৎপিণ্ডে আঘাত কর, দেখিবে তাহা হইতে জ্ঞান-বিবেকের ফল্গুধারা সহস্রধারে উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

খোদার প্রকৃত আরেফ যাহারা—তাহাদের নিষ্কলুষ প্রাণ মাটীর পিঁজরা হইতে বাহির হইয়া সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণের বদৌলতে খোদার প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে, তখন তাহাদের ললাটে সাধুতার চিহ্ন ঝলিয়া ওঠে। ফেরেশতা রাজ্যে তাহারা গৌরবময় আসন লাভ করে। কেয়ামতের দিন "সিদ্দিক" অর্থাৎ সত্যপরায়ণ দলের সহিত তাহাদের হাশর হইবে।

মনে রাখিও, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিতে হইলে নিজকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে হইবে। দুনিয়ার প্রত্যেক অণু পরমাণুকে পর্য্যন্ত ভুলিতে হইবে। তুমি নিজের অস্তিত্বকে ভুলিয়া যাও, দেখিবে দুনিয়ার কোন চালবাজী, কোন প্রলোভন, কোন দুঃখ-বেদনা তোমাকে প্রলুব্ধ ও কাতর

করিতে পারিবে না। ভিতরে পশু প্রবৃত্তিটিকে যখন তুমি হত্যা করিতে সমর্থ হইবে, তখন তোমার দেহ ও মন ছুটিবে খোদার দিকে। তোমাকে আর সাধ্য-সাধনা করিবার প্রয়োজন হইবে না। আরেফ্ যে সময়ে নিজের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে, তখনই সেদৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইবে, খোদার জ্যোতিঃ।

খোদা প্রেমিকগণ অন্তর চক্ষু দিয়া পার্থিব জগতকে দেখিয়া থাকেন না। সেই কারণে তুনিয়ার ফেরেব্-শয়তানী তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিতে পারে না। ইঁহারা এক মাত্র খোদাকে দেখিবার জন্য তাহাদের অন্তর চক্ষু নিয়োজিত রাখিয়াছেন। পার্থিব সাফল্য কিছুই নহে, উহা শুধু মানুষকে তুনিয়াদারীর ফাঁদে ফেলার এক কৌশল বিশেষ। লালসা ও ভোগ বিলাসের দিকে যাহাদের অন্তর অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট, তাহাদের দেহের প্রতি লোম কূপের ভিতর শয়তানের প্রবেশ সহজ সাধ্য। এই অবস্থায় তুনিয়ার নানা রঙ্গিন প্রলোভন দেখাইয়া শয়তান তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

কেয়ামতে পৌঁছিবার পথে তুনিয়া মাত্র একটী পান্থ নিবাস বিশেষ, এই কয়দিনের জন্য পান্থ নিবাসে চিরস্থায়ী থাকিবার মনোবৃত্তি লইয়া বাস করার কি কোন অর্থ হইতে পারে?

ধর্ম্মনিষ্ঠা বা পরহেজগারী

শরিয়তের হুকুম মোতাবেক্ চলার নাম পরহেজ্গারী। অর্থাৎ খোদার আদেশগুলি প্রতিপালন এবং নিষেধগুলি হইতে

দূরে থাকা। আহারে বিহারে, লেবাসে পোষাকে সকল বিষয়ে এই নীতির পরিচয় দিতে হইবে। অন্যান্য পরহেজ্‌গারীর সঙ্গে নিম্ন লিখিত দশটী গুণের সমাবেশ না হইলে তোমাকে প্রকৃত পরহেজ্‌গার বলা যায় না। যথা—

(১) জিহ্বাকে সংযত করিবে।

(২) পরনিন্দা করিবে না।

(৩) কাহাকেও ঘৃণিত বা হেয় মনে করিও না। কাহারও প্রতি বিদ্রূপ করিবে না।

(৪) পর স্ত্রীর উপর দৃষ্টিপাত করিও না।

(৫) সাধুতা, সত্যবাদিতা জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত মনে করিও।

(৬) খোদাতায়ালার অনুগ্রহকে সর্ব্বদা মনে রাখিবে এবং শুকুর গোজারী করিবে।

(৭) সর্ব্বদা নিজের ধন সম্পত্তিকে খোদার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিবে। নিজের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া উহা ব্যয় করিও না।

(৮) নিজের দৈহিক ও মানসিক সুখ শান্তি এবং আয়েশ আরাম কামনা করিও না। আত্মগৌরব মন ও মস্তিষ্ক হইতে মুছিয়া ফেল। খোদা বলিয়াছেন,—বেহেশতই আসল সুখের স্থান, দুনিয়ায় যাহারা সুখের কামনা করে নাই, তাহাদিগকে আমি ঐ মহাসুখের স্থান দান করিব।

(৯) সর্ব্বদা সকল অবস্থায় নামাজ আদায় করিবে।

(১০) নবীর সুন্নত্‌ পালন করিবে।

এস্মে আজম

আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামগুলির মধ্যে এস্মে আজ্ম কোন্টী, তাহা সঠিক ভাবে নির্ণিত না হইলেও "আল্লাহ" নামটী যে এস্মে আজ্ম, ইহা অনেকেরই বিশ্বাস। এই এস্মে আজম-এর মাহাত্ম্য এবং গৌরব ধারণার বহির্ভূত। ইহা রোগে মহৌষধ, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে ত্রাণকর্ত্তা। পাঠকের অন্তর্দ্দেশে খোদা ছাড়া অন্য কিছুরই চিন্তা ও অস্তিত্ব যখন স্থান না পাইবে, তখনই এই এস্মে আজম পাঠের উপকারিতা বুঝা যাইবে।

'আল্লাহ' এমন গৌরবময় শব্দ যাহা পাঠ করিলে বিষ পানি হইয়া যায়, দুঃখ ঘুচিয়া যায়, শঙ্কট দূর হয়। তুমি এই মহিমান্বিত নামে খোদাকে স্মরণ কর, তিনি তোমাকে নৈকট্য দান করিবেন। তুমি তওবার সহিত তাঁহাকে এই নামে স্মরণ কর, তিনি ক্ষমা করিবেন। তুমি মিনতির সহিত তাঁহাকে স্মরণ কর তিনি তোমাকে কল্যাণের সহিত স্মরণ করিবেন। তুমি তাঁহাকে সংকীর্ণ রুজী অবস্থায় স্মরণ কর, তিনি তোমাকে বরকাত দান করিবেন। তুমি তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা কর, তিনি মুক্তি দান করিবেন। তুমি এবাদত ও বন্দেগীর সহিত তাঁহাকে স্মরণ কর, তিনি তাঁহার অফুরন্ত নিয়ামতের ভাণ্ডার তোমার জন্য উন্মুক্ত করিবেন।

মোটা কথা—এই এস্মে আজম্ সকল বিপদ দূরকারী সকল দুঃখের অবসানকারী। সর্ব্বদা এই পবিত্র নাম যে অন্তরে ধ্বনিত হয়,তথায় আল্লাহর অনুগ্রহ ধারায় ধারায় নামিয়া থাকে।

'ফকীর' শব্দের তাৎপর্য্য

এক ব্যক্তি বড় পীর সাহেবের নিকট 'ফকীর' শব্দটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—এই শব্দটী ৪ টী অক্ষর দ্বারা গঠিত যথা—'ফে' 'কাফ্', 'এয়া' 'রে' ইহার প্রত্যেকটী অক্ষরের তাৎপর্য্য এবং মর্ম্ম পৃথক পৃথক যথা—

(১) 'ফে' অক্ষরের অর্থ "ফানা ফিল্লাহ্" অর্থাৎ যে নিজের অস্তিত্ব আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করিয়াছে।

(২) 'কাফ্' অর্থ 'কাল্ব' অর্থাৎ অন্তঃকরণকে খোদার জেক্রে নিয়োজিত করা।

(৩) 'এয়া' অর্থ 'এয়াদে এলাহী' অর্থাৎ খোদার স্মরণে দিনপাত। তাঁহার অনুগ্রহের প্রত্যাশা, তাঁহার শাস্তির ভয় রাখা।

(৪) 'রে' অর্থ রেক্কাতে কালব্ অর্থাৎ মনের সমস্ত কামনাকে দূরীভূত করিয়া খোদার দিকে রুজু করা।

'ফকীর' এর গৌরবময় আখ্যা পাইতে হইলে তোমাকে নিম্নলিখিত গুণ ও বিশেষত্বগুলি অর্জ্জন করিতে হইবে—

(১) সর্ব্বক্ষণ এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকিবে।

(২) কাহারও সহিতে কলহ করিবে না। কোন কারণে ঝগড়ার সূত্রপাত হইলে তখনই তাহা মিটাইয়া ফেলিবে।

(৩) তোমার আচরণ সৎ এবং উদার হইবে। অন্তরকে সংকীর্ণ করিবে না।

(৪) নিজকে সকলের চেয়ে হেয় মনে করিবে।

(৫) বেশী হাস্য করিবে না। উচ্চ হাসি সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।

(৬) না-জানা বিষয় জানিয়া লইবে।

(৭) ভ্রান্তকে সদুপদেশ দিবে। মূর্খকে শিক্ষা দান করিবে।

(৮) উপকারের পরিবর্ত্তে উপকার করিবে। এই রূপ অপকারের প্রতিশোধে না লইয়া উপকার করিবে। কাহাকেও ব্যথা দিবে না। তুমি নিজে ব্যথা পাইলে সব্‌র করিবে।

(৯) অনর্থক বাজে কথা বলিবে না। কিম্বা বাজে বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবে না।

(১০) হারাম কার্য্যের ত্রিসীমায় যাইবে না।

(১১) অসহায় দরিদ্র এবং বিপন্নের সাহায্য করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না।

(১৩) আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতি দয়াশীল হইবে।

(১৪) প্রত্যেকের প্রতি শিষ্টাচার এবং ন্যায় নীতি প্রদর্শন করিবে, কাহাকেও অন্যায় করিতে দেখিলে নীরবে সহ্য করিও না। কারণ উহা দুর্ব্বলতা। উচিত কথা বলিতে কাহারও পরওয়া করিবে।

(১৫) কাহার ও প্রতি হিংসা ও দ্বেষ রাখিবে না। বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মান এবং কনিষ্ঠদিগকে স্নেহ প্রীতির চক্ষে দেখিবে।

(১৬) আমানতে খেয়ানত করিবে না।

(১৭) অল্প কথা বলিবে। শরিয়তপন্থী গরীবদিগের সাহায্যকারী হইবে। তাহাদিগকে তোমার সমবৈঠকে স্থান দিবে। প্রতিবেশীদিগকে দুঃখ দিবে না।

(১৮) পরনিন্দা করিবে না। কাহারও অন্যায় দোষারোপ করিও না।

খোদা ভীতি

খোদার প্রতি ভয় কয়েক প্রকার। গোনাহর কার্য্য করায় গোনাহগারের মনে এক প্রকার ভয়ের উদ্রেক হয়। এবাদত কবুল হইল কিনা আবেদের মনে সর্ব্বদা এই ভয় জাগে। যাহারা আরেফ্ অর্থাৎ খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত, তাহাদের মনে ভয় জাগে আল্লাহ তায়ালার শাক্তিমত্তার। খোদা-প্রেমিকের মনে ভয় ও চিন্তা জাগে—"সে খোদার প্রেম পাইবার উপযুক্ত কি না"। এই শ্রেণীর মধ্যে আরেফ্দের ভয়ের গুরুত্ব বেশী।

সব্র বা সহনশীলতা

নৈসর্গিক বিপদ আপদ এবং শোক-বেদনায় চিত্তের অটল অচল ভাব থাকার নামই সবর। সাবের খোদার এই মহা পরীক্ষায় কখনই বিচলিত হয় না। বিপদ তারই সম্মুখে আসে যে বিপদকে চিনিয়াছে, যাহাদের মন অবিচলিত বিপদ তাহাদিগকেই কামিয়াবীর পথে তুলিয়া দেয়। ধৈর্য্যশীল দরিদ্র, শুকরগোজার বড় লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিপদে বাহ্যিক প্রফুল্লতা নষ্ট হইলে সবরকারীর বিশেষত্বও নষ্ট হয়।

'কাজা' ও 'কুদরত' সম্পর্কে উপদেশ দানকালে সর্পাকৃতিধারী জ্বিনের পরীক্ষা

আমরা কিছু পূর্ব্বে হজরত বড় পীর সাহেবের লিখিত অমূল্য পুস্তকাবলীর মধ্যে 'ফতুহল গায়েব' সম্পর্কে যৎসামান্য পরিচয় দিয়াছি। এই 'ফতুহল গায়েব' কেতাবে তাঁহার যে ৭৮টী উপদেশ ও চিন্তাধারা রহিয়াছে, ইহার এক একটী তরিকত ও মারেফাত শিক্ষার খনি—খোদা প্রাপ্তির এক স্বর্ণময় সেতু। বিশুদ্ধ অন্তরে ইহা পাঠ করিলে মারেফতের শুভ্রোজ্জ্বল আলোকে প্রাণ ভরিয়া উঠিবে। অনিত্য সংসারের ভোগ-লালসা তিরোহিত হইয়া মনের কূলে পরলোকের চিরস্থায়ী সওগাত বোঝাই তরী ভিড়িবে, সংসারের শোখ দুঃখ, ব্যথা-বেদনা আর তাহাকে কাতর করিতে পারিবে না। আমরা 'ফতুহল গায়েব' হইতে একটী অংশ অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

একদিন হজরত বড় পীর সাহেব "কাজা" ও "কুদ্‌রত" অর্থাৎ প্রাণীজগতের নির্দ্ধারিত ভাগ্য এবং খোদার গৌরব-শক্তি সম্বন্ধে লোকদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন, সহসা একটী সর্প কোথায় হইতে আসিয়া হুজুরের উরুর উপর বেড়াইতে লাগিল, হুজুরের সে দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। কিছুক্ষণ পরে সর্পটী তাঁহার জামার ভিতর ঢুকিয়া গাত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল, ইহাতেও হুজুরের তন্ময়তা ভাঙ্গিল না। তিনি

উপদেশ দিয়াই চলিয়াছেন, গায়ে মাছি বসিলেও লোক একটু নড়াচড়া করে, কিন্তু হুজুর ঠিক যেন প্রস্তরবৎ নিশ্চল। এতবড় একটী বিষধর প্রাণী তাঁহার দেহের উপর, অথচ সে দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য নাই, কিংবা বিচলতার একটু মাত্রও লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না। সর্পটী কিছুক্ষণ পর তাঁহার জামার ভিতর হইতে বাহির হইল, এবং ফণা তুলিয়া হুজুরের মুখের সম্মুখে দাঁড়াইল। হুজুর তাহাকে যেন কি বলিলেন, সেও যেন নীরব ভাষায় কি বলিয়া সহসা উধাও হইল। বক্তৃতা শেষ হইল, শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হুজুর! সর্পটীর আগমন আমাদের নিকট দারুণ রহস্যময় বিবেচিত হইতেছে। দয়া করিয়া এসম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল দূর করুন।" ইহা শুনিয়া বড় পীর সাহেব কহিলেন—"তোমাদের অনুমান মিথ্যা নহে, সর্পটীর উপস্থিতি বাস্তবিকই একটা রহস্যময় ব্যাপার। একটী জীন সর্পের আকৃতিতে আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—'সত্যই আপনি অপূর্ব্ব দৃঢ়চেতা লোক। আমার এত উৎপাতে আপনি একটুও বিচলিত হইলেন না, আশ্চর্য্য!' আমি তাহাকে কহিলাম—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আমি "কাজা" ও "কুদরত" সম্পর্কে লোকদিগকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেছিলাম। এই অবস্থায় সামান্য একটী কীট দেখিয়া বিচলতা দেখাইলে আমার কথা এবং কাজের সামঞ্জস্য কোথায় থাকিবে? তখন কি আমি মোনাফেক্ সাজিব না? ইহা শুনিয়াই সে চলিয়া গেল।" হজরত বড় পীর সাহেব তখন নিম্নলিখিত উপদেশটী দিতেছিলেন, ইহা

তাঁহার 'ফতুহল গায়েব' কেতাবের ৬২টী "মাকুলা"র মধ্যে অন্যতম।—

'কাজা' এবং 'কুদরত' খোদার—অনন্ত শক্তিশালী খোদা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ভাগ্যলিপি। ইহার প্রভাবে মানুষকে জীব-জগতের নিকট মৃত—প্রাণহীন বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। অর্থাৎ ধর্ম্ম-শরিয়তের আদেশ-আহকাম পালনে সে হইবে দুর্জ্জয় বীর, কিন্তু প্রবৃত্তি, বাসনা-কামনার নিকট তাহাকে পরিচয় দিতে হইবে—মৃত বলিয়া। পার্থিব কামনা, মনের পশু প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর, তখন দেখিতে পাইবে, তোমার অন্তরে খোদার চিন্তা, খোদার সত্ত্বা ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। জীবজগতের নিকট তুমি যখন মৃত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে, তখনই তুমি মারেফাতের স্বর্গীয় মদিরায় তৃপ্তি পাইবে, তুমি তখন দুনিয়ার সকল বিপদ হইতে মুক্ত। জীবজগতের নিকট মৃত—এই কথার সহজ অর্থ এই যে, তুমি তাহাদের নিকট কোন আকাঙ্ক্ষা করিবে না, কিংবা তাহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করায় তোমাকে পীড়া দিবে না। পশু প্রবৃত্তি এবং রিপুসমূহের নিকট তুমি প্রাণহীন; এই কথার অর্থ কি? যখন ভাল এবং মন্দ, ব্যথা এবং সুখ-দুঃখ, বিপদ এবং আনন্দ তোমার নিকট কোনই পার্থক্য বলিয়া মনে হইবে না, তখনই তুমি হীন প্রবৃত্তি এবং রিপু সমূহকে জয় করিয়াছ বলিয়া মনে করিতে পার, তখন তাহারা আর তোমার ধারেও ঘেঁসিবে না, কারণ সেই সময় তোমাকে ইহারা মৃত বলিয়া মনে করিবে। খোদার উপর সবই ন্যস্ত কর, তিনিই তোমার একমাত্র প্রতিপালক। তোমাকে রক্ষা

করিবার,তোমার বাসনা পূরাইবার দায়িত্ব তাঁহারই, দুনিয়ার আর কোনও শক্তি এই দায়িত্ব বহন করিবার যোগ্য নহে। একবার চিন্তা কর—যখন তুমি মায়ের গর্ভে অন্ধ কারাপ্রাচীরে ছিলে, সেই সময় কে তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে? কে তোমার সেই অসহায় অবস্থায় জাগ্রত-প্রহরীর কার্য্য করিয়াছে? মায়ের কোলে যখন তুমি দুগ্ধ-শিশু—গায়ে একটী মাছি বসিলেও তোমার যখন তাড়াইবার সামর্থ্য ছিল না, এই অবস্থায় কোন্ শক্তিমান্ হস্ত সকল সময় তোমার উপর বিস্তৃত থাকিত? তাহা কি বিশ্বস্রষ্টা—বিশ্ব রক্ষক খোদার অনুগ্রহ নহে?

বাসনা-কামনার নিকট তুমি মৃত, এই কথার অর্থ কি? অর্থাৎ যখন তুমি বা তোমার অন্তর কিছুরই জন্য লালায়িত হইবে না, তোমার প্রাণে বাসনা-কামনার যখন লেশমাত্র থাকিবে না, তখনই তুমি ইহাদের বিবেচনায় মৃত বৈ আর কিছু নহ। তোমার মনে যদি কোন আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহা একমাত্র খোদার জন্যই জাগিবে এবং তুমি তোমার সকল ইচ্ছা তাঁহারই উপর নির্ভর করিবে। এই অবস্থায় খোদার ইচ্ছাকে তোমার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে থাকিবে, তখন মনে হইবে তুমি খোদার ইচ্ছা প্রকাশের একটী যন্ত্রবিশেষ মাত্র। যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নীরব, অন্তর শান্তিতে ভরা, বক্ষঃ উদার, মুখমণ্ডল দৃপ্ত, প্রবৃত্তি সংযত দুনিয়ায় তাহাদের ভাবনা ও চিন্তার কি রহিয়াছে? তখন খোদাই তাহাদের পরিচালক, স্বর্গীয় নকীব্ তাহাদের পথ প্রদর্শক, তখন খোদাই তাহাদের ভালমন্দ শিক্ষাদাতা। এই অবস্থায় তাহারা সত্যই মারেফাতের স্বর্গীয় প্রেরণা লাভে ধন্য!

প্রত্যেক বস্তুর ক্রমিক সোপান রহিয়াছে। মারেফাতের প্রথম সোপান হইল সাধারণ মানবীয় অবস্থা, এই সময়ে তুমি নিছক মাটীর মানুষ বই আর কিছুই নহ। কিন্তু সাধনার দ্বারা যখন তুমি এই ধাপ অতিক্রম করিবে, তখন দেখিতে পাইবে, তোমার প্রথম অবস্থা হইতে এই অবস্থার কত পার্থক্য! তখন মারেফাতের স্বর্গীয় রশ্মি তোমার অন্তরে প্রজ্বলিত, তোমার নিজের শক্তি, নিজের ইচ্ছা, নিজের কামনা-বাসনা কোথায় তিরোহিত হইয়াছে। তদ্স্থানে খোদার মহিমা, খোদার ইচ্ছা তোমার অন্তর রাজ্যে ভরপুর, তখন তোমার নিজেরই নিকট তোমার নিজের অস্তিত্ব বিবেচিত হইবে না। ছিদ্র পাত্রে যেমন পানি থাকিতে পারে না, সেইরূপ তোমার অন্তরে তখন কিছুই স্থানলাভ করিতে পারিবে না। তখন তুমি মানবতার উর্দ্ধে, খোদারই শক্তি—খোদারই গৌরব মহিমায় তুমি অনুপ্রাণিত, এই সময়ে তোমার প্রতি কার্য্যে—প্রতি কথায় কারামত প্রকাশ পাইবে, ইহাকেও তুমি খোদার মহিমা বলিয়া নতশিরে স্বীকার করিবে। মারেফাত জীবনের এই স্তর বড় গৌরবের। সেই সময়ে নাফ্ছ আসিবে হাতের মুঠার ভিতর, স্বর্গীয় প্রেরণা, ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা তখন তুমি নাফছের পক্ষে ভীতিপ্রদ। হজরত রসুলে আক্রম (সঃ) বলিয়াছেন—তিনটী বিষয়ের প্রতি আমি অনুরক্ত, এক—সুগন্ধি, দুই—স্ত্রী, তিন—নামাজ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) মারেফাতের খনি, মারেফাতের কেন্দ্রীয় শক্তি, তাঁহার মধ্যে এইরূপ অনুরক্তি কেন থাকিবে? ইহার উত্তরে রসুলুল্লাহ (সঃ) নিজেই বলিয়াছেন—

নামাজ আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান্ হইতেছে যে, তিনি প্রথমেই নামাজের মধ্য দিয়া নাফ্ছকে খোদার কাছে সমর্পন করিয়াছেন, তারপর খোদার সান্নিধ্য হইতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহার নাফ্ছ অন্য দুইটী বিষয়ে আকাক্ষী হইয়াছিল, ইহা রসুলুল্লাহের (সঃ) নিজস্ব আকাক্ষা নহে, বরং উহা খোদার তরফ্ হইতে সুনিয়ন্ত্রিত। খোদা বলিয়াছেন—"আমি মানুষের অতি নিকটে"। খোদার জন্য যে তাহার অন্তর বিলাইয়া দিয়াছে, খোদাও তাহার নিকটে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত খোদার জন্য অন্তর পার্থিব কামনা হইতে পবিত্র না করা হয়, ততক্ষণ সেই অন্তরে খোদার আসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

খোদা যখন নূতন জীবন দান করেন, তখন সেই অন্তরে নূতন ইচ্ছাশক্তিও দান করেন। এই ইচ্ছা তাঁরই ইচ্ছাশক্তির রূপান্তর মাত্র। হাদিস্ কুদ্সীতে বর্ণিত আছে খোদা বলিয়াছেন—আমার বান্দাগণ, যখন আমাকে ভালবাসার দ্বারা স্মরণ করে তখন আমিও তাহাদিগকে ভালবাসি, যখন আমি তাহাদিগকে ভালবাসি তখন আমি হই তাহাদের কর্ণ, তাহাদের চক্ষু, তাহাদের হস্ত এবং তাহাদের চলচ্ছক্তি, তাহারা যাহা কিছু দেখে আমারই মধ্য দিয়া দেখে, যাহা কিছু শুনে আমারই মধ্য দিয়া শুনে, যাহা কিছু করে আমারই মধ্য দিয়া করে, ইহা 'ফানাফিল্লাহ' অবস্থার একটী স্তর। এই স্তরে উপনীত হইয়া যখন তুমি সম্পূর্ণ খোদার প্রতি আত্মসমর্পন করিবে, পার্থিব সম্পর্ক ত্যাগ করিবে, কাহারও ভয়-ভীতি, অনুগ্রহ-নিগ্রহ কিম্বা

নিষ্ট-অনিষ্টের ধার ধারিবে না, তখনই মনে করিও তুমি ফানাফিল্লার পূর্ণ সাধক। তখন তোমার চক্ষুদ্বয় খোদার নিদর্শন ব্যতীত আর কিছু দর্শন করিবে না। খোদার নিকট হইতে ভাল কি মন্দ যাহাই কিছু তোমার প্রতি আপতিত হউক না কেন, তোমার কাছে তাহা সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই অবস্থায় তুমি পরম সৌভাগ্যশালী, ইহাই প্রকৃত 'ফানা', ইহাই সাধকের প্রকৃত গন্তব্য, ইহাই সুফীদের শেষ মঞ্জিল। এই অবস্থায় উপনীত সাধকদের নামই আব্‌দাল। কারণ তাঁহাদের নিজের ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত হইয়া তদ্‌স্থানে খোদার ইচ্ছা বলবতী হয়। মানুষ ভ্রান্তিশীল, তাই অজ্ঞাত ভ্রান্তির বশে যদি তাঁহার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত বান্দাগণ কোন অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই খোদার নিকট হইতে আসে সতর্কতার কষাঘাত। কোন অন্যায় বাসনা হইতে ওলিগণ এবং অন্যায় উদ্দেশ্য হইতে আব্‌দালগণ সর্ব্বদা মুক্ত থাকেন।

—

তওবা ভঙ্গকারী মুরিদের প্রতি বড় পীর সাহেবের তীব্র ভৎর্সনা

হজরত বড় পীর সাহেবের কোন মুরিদ যদি 'তওবা' ভঙ্গ করিয়া অন্যায় কাজ করিত, তাহা হইলে হুজুর অতিশয় দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইতেন এবং এইভাবে তাহাকে মৃদু-কঠোর তিরস্কার করিতেন—

—"হে হতভাগ্য! আমি তোমাকে সত্যপথে আহ্বান করিয়াছিলাম, আর তুমি তাহা কবুল করিলে না। আমি তোমাকে অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করিলাম, তুমি তাহা শুনিলে না, আমি তোমাকে কতই না খোদার শাস্তির ভয় দেখাইলাম, কিন্তু তুমি বিন্দুমাত্রও পরওয়া করিলে না। আমি তোমাকে দীর্ঘদিন সুসংবাদ শুনাইলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিলে। তুমি আমার সহিত 'আড়ি' পাতিয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে, যদি আমি তোমাকে অন্যায়ের পথ হইতে না ফিরাই, তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে আমার সান্নিধ্য হইতে বিতাড়িত করি, তাহা হইলে তোমার পরিণাম কি হইবে, একবারও কি ভাবিয়াছ? তোমার কি স্মরণ নাই, কিরূপ বিনম্র এবং বিনীতভাব দেখাইয়া তুমি প্রথম আমার নিকট আসিয়াছিলে এবং আমিও সরল বিশ্বাসে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখন তুমি আমার অবাধ্য সাজিয়াছ। আমি বিস্মিত হইতেছি, যে ব্যক্তি একবার আমার স্নেহ লাভ করিয়াছে, সে কি করিয়া উহা পরিত্যাগ করে। যে ব্যক্তি একবার আমার ভালবাসার শারাব্ পান করিয়াছে, সে কেমন করিয়া তাহা ভুলিতে পারে। তুমি কপট বিশ্বাসী, নচেৎ নিশ্চয়ই তুমি আমার সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে না। আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্রও মমতা থাকিত, তাহা হইলে আজ তুমি আমার শত্রু সাজিতে না। আমার কষ্ট তোমার শান্তির কারণ হইত না। বন্ধু, বন্ধুর গৃহ হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরাইয়া যায় না, কিন্তু আমাকে যাইতে হইতেছে। তুমি

সৃষ্ট না হইলে বরং ভালই হইত, কিন্তু যখন তুমি সৃষ্ট হইয়াছ, তখন মনে রাখিও, তোমাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সৃষ্টিকর্ত্তার কি ছিল।

এখনও সময় আছে, এখনও চোখ খুলিয়া দেখ, গাফ্‌লতের নিদ্রা ভাঙ্গ, ঐ দেখ তোমার সম্মুখে—খোদার শাস্তিদানের লশকরগণ তোমার শিয়রে দণ্ডায়মান। কেবল খোদার অনুগ্রহের জন্য তুমি এখনও নিরাপদ রহিয়াছ, নচেৎ ঐ বাহিনীর হাতে নিস্তার পাইতে না।

"ভ্রাতঃ! তোমার সম্মুখে এক দীর্ঘ প্রবাস যাত্রার দিন আসিতেছে, তাহার জন্য প্রস্তুত থাক, ভাবিয়া দেখ তোমার সেই গন্তব্যের পরিণতি কোথায়। বয়সের দীর্ঘতা, ধনদৌলতের প্রাচুর্য্য এবং পদমর্য্যাদার গৌরবে ভুলিও না, সময়ের সুযোগ হারাইলে আখেরাতে পস্তাইতে হইবে। কুহকিনী দুনিয়ার রঙিন নেশায় মত্ত থাকিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিও না। আখেরাতের কঠিন আজাব হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য কিছু ব্যবস্থা এখন করিয়া রাখ। মায়াবিনী দুনিয়া তোমার গর্দ্দানের উপর সুতীক্ষ্ণ তরোবারী তুলিয়া তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে, সুযোগ পাইলেই সে তোমার কাঁধে আঘাত হানিবে। বহু লোককে সে তাহার কুহকজালে ফাসাইয়াছে, তোমাকেও ফাসাইতে উদ্যত। এমন কি তোমাকে গোরে না লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সে তোমার পশ্চাতে লাগিয়াই থাকিবে, এই অবস্থায় যদি তোমাকে একবার কবরে লইয়া যাইতে পারে, তখন তোমার কি দশা হইবে? চোখ দিয়া অশ্রুর পরিবর্ত্তে

রক্ত বাহির করিলেও তখন এক কানা কড়িরও ফল হইবে না।"

বড় পীর সাহেবের এই শ্লেষপূর্ণ উপদেশ অতি পাষাণ প্রাণও শতধারে গলাইয়া দিত। তাঁহার কথা যেমন ছিল পুষ্পের মত কোমল, সেইরূপ ছিল বজ্রের মত কঠিন, যাহার ভিতর দোষ-ত্রুটী এবং দুর্ব্বলতা থাকিত, তাহার প্রাণে ইহা আঘাত করিত—বজ্রের মত, আর যাহার প্রাণ ছিল নিষ্কলুষ, তাহার নিকট ইহা বিবেচিত হইত পুষ্প-কোমল। কেহ বেশীক্ষণ হুজুরের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে পারিত না, অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনিই আসিয়া হুজুরের পাদমূলে আত্মসমর্পণ করিত। হয়ত কোন ভ্রান্ত ক্ষণিক ভ্রান্তির বসে অন্যায় পথে ধাবিত হইয়াছে, হুজুর তখন তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধন্য গওসল আজম, আর ধন্য তাঁহার মুরিদগণ !!

একাদশ পরিচ্ছেদ

বড় পীর সাহেবের গৌরব-মহিমা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ ওলীদের অভিমত

হজরত মাহবুবে সোভহানী, কুতবে রব্বানী, গাওসে সাম্‌দানী শেখ আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলায়হে যে কি উন্নত দরজার ওলী ছিলেন, আমাদের সসীম জ্ঞানের ভিতরে থাকিয়া আমাদিগকে তাহা উপলব্ধি করিতে হয়, সুতরাং আমরা তাঁহাকে সম্যক চিনিতে পারি না, তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব তাঁহার কামালিয়াতের অশেষ দরজা, আমাদের কাছে রহস্যাবৃত, আমাদের সংকীর্ণ ধারণা শক্তি সে রহস্যজাল ভেদ করিতে অক্ষম। গোষ্পদে অসীম আকাশের প্রতিবিম্ব দেখিয়া যদি আমরা মনে করি যে, আকাশ কত ক্ষুদ্র, ইহা আকাশের পক্ষে অগৌরবের নহে, আমাদেরই জ্ঞানের সংকীর্ণতা—বুদ্ধির দুর্ব্বলতা। ফার্সি কবি সুন্দর কথাই বলিয়াছেন—

"কাদ্‌রে জাওহর্‌ শাহ্‌ বেদান্দ এয়া বেদান্দ জাওহারী"
কাদ্‌রে গাওহর বুলবুল বেদানদ্‌ এয়া বেদানদ শাপরী''

অর্থাৎ—"মণি-মুক্তার মূল্য এবং মর্য্যাদা জানেন বাদ্‌শাহ এবং আর জানে মণিকার। ফুলের মর্য্যাদা চিনিয়াছে বুল্‌বুল্‌ পাখী আর চিনিয়াছে মালী।" যাঁহারা তাসাওফ্‌-এর মণি-মুক্তার খনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই পীরানে পীর, গওসল আজমের প্রকৃত মর্য্যাদা অবগত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আমরা এই শ্রেণীর কতিপয় ওলী, দরবেশ, গওস্ ও কুতবের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, তাঁহারা নিজে এক এক জন শ্রেষ্ঠ ওলী হওয়া সত্ত্বেও হজরত বড় পীর সাহেবের প্রতি কতখানি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা, কতখানি তাজিম্ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাদের ধারণা ছিল—হজরত বড় পীর সাহেব তাসাওফের মহাসমুদ্র, আর তাঁহারা সমুদ্রে বুদ্বুদ তুল্য। বড় পীর সাহেব ওলী-আল্লাহগণের মধ্যে পূর্ণিমা মাহ্তাব্ আর তাঁহারা খদ্যোতিকার ক্ষীণ বিকাশ। বড় পীর সাহেব এলমে মারেফাত এবং এলমে লাদুন্নির মহাসিন্ধু, আর তাঁহারা বিন্দু পরিমাণ শিশির।

শেখ আবু মাদায়েন বিন শোয়ায়েব্ মাগ্রেবী (রঃ) বলিয়াছেন—একদিন জিন্দাপীর হজরত খেজের (আঃ) এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহার নিকট প্রাচ্য প্রতীচ্য সকল দেশের ওলী-আল্লাহগণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর আলোচনা উঠিল। ইহা শুনিয়া হজরত খেজের কহিলেন —শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর কথা আলোচনার বাহিরে। তিনি আওলিয়া শ্রেণীর মধ্যে যে কত উন্নত দরজা প্রাপ্ত, তাহা চিন্তা করিতে আমাকেও হতবুদ্ধি হইতে হয়।

পীর বাঁকা বিন বতু নাহরে মক্কী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন —আমি একদিন বড় পীর সাহেবের উপদেশ দান শ্রবণ করিতে ছিলাম, ঐ সময়ে হুজুর মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে ছিলেন, হঠাৎ তিনি কিছুক্ষণের জন্য

বক্তৃতায় ক্ষান্ত দিয়া নিম্নে নামিয়া আসিলেন, এবং কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় সোপানে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ বক্তৃতা দিতে শুরু করিলেন। এই সময়ে আমি প্রথম সোপানের দিকে চাহিয়া দেখি—এক বিস্ময়কর ব্যাপার। দেখিলাম, প্রথম সোপান-খানি খুবই প্রসার হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার উপর অতি মূলবান আলো-ঝলমল ফরাশ পাতা। আর সেই ফরাশের উপর বসিয়া আছেন—সরওয়ারে কায়েনাত, ফরখে মোওজুদাত হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ)। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন—হজরত আবুবকর সিদ্দিকী, হজরত উমর ফারুক্, হজরত ওসমান এবং হজরত আলী (রঃআঃ)। ইহার দ্বারা সহজে প্রতীয়মান হয়, গওসল আজম কোন্ শ্রেণীর ওলী ছিলেন।

শেখ আবু ওমর এবং শেখ ওসমান বর্ণনা করিয়াছেন—আমরা পীর সোওয়েদ সানজবী (রঃ) এর মুখে বহুবার শুনিয়াছি—শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) আমাদের অগ্রণী, আমাদের পথ প্রদর্শক, আল্লাহ ও রসুলের পথে লইয়া যাইতে তিনি আমাদের দীক্ষাগুরু, তৎকালীন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদাশীল।

পীর আবু সোলায়মান মনজুরী বর্ণনা করিয়াছেন—একদিন অতি প্রবীন পীর শেখ আকিল (রঃ) এর নিকট আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে কহিলাম—শেখ আব্দুল কাদের জিলানী নামক এক তরুণ যুবক বাগদাদে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার সুখ্যাতি সুযশ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহা শুনিয়া পীর আকিল কহিলেন—

ছুনিয়ার আর কত খানিই বা তাঁহার সুখ্যাতি রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, আকাশে তাঁহার সুযশ-সুখ্যাতি আর ধরে না। আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাঁহাকে অতি সম্মানজনক লকবে ডাকিয়া থাকেন।

পীর ওমর সুলহাজী বর্ণনা করিয়াছেন—একবার আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু কোন কার্য্য ব্যপদেশে বাগদাদে যাইবার জন্য পীর শেখ আবু নাসিরের খেদমতে উপস্থিত হইয়া অনুমতি চাহিলেন। পীর আবু নাসির কহিলেন—'বাবা, তুমি বাগদাদে যাইয়া অবশ্য অবশ্য শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাঁহাকে আমার সালাম জানাইয়া বলিও যে, আবু নাসির আপনাকে দোওয়া করিতে বলিয়াছেন। আরও বলিও, হুজুরের অন্তরে তিনি যেন এক বিন্দু স্থান পাইয়া ধন্য হইতে পারেন। স্মরণ রাখিও বাবা, শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর তূল্য শ্রেষ্ঠ মানব কোন জামানায় আর হইবে না। এলম্ ও বংশের মর্য্যাদায় তিনি সমস্ত ওলী-আল্লাহের মুকুট মণি।

শেখ ওমর বাচ্ছাজ বর্ণনা করিয়াছেন—বহুদিন হইতে পীর আদি বিন মোসাফিরের জিয়ারাত লাভের বাসনা আমার অন্তরে প্রবলভাবে জাগ্রত ছিল। আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইবার জন্য পত্র দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাকে 'হাবলহেকার' নামক স্থানে উপনীত হইয়া সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন, তদনুসারে আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে পরম

সমাদরে গ্রহণ করিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার পর কহিলেন—হে ওমর! সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্র নহরের কূলে ছুটিয়াছ। এই যুগে শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) সমস্ত ওলীদের উপরি-কর্ত্তা (Higher officer)। সমগ্র ওলী আল্লাহর যোগ সূত্রের তিনিই কেন্দ্রীয় শক্তি।

কুদ্‌রতুল্ আরেফিন্ শেখ আলী এবনো অহব্ শায়বানী বলিয়াছেন—শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ওলী-আল্লাহ-গণের মধ্যে সম্রাট। যে ব্যাক্তি তাঁহার খেদমতে হাজির হইবার কিম্বা তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার জীবন ধন্য!

পীর শেহাবুদ্দিন ওমর সাহ্‌রাওয়ার্দ্দী বলিয়াছেল—৫৩৬ হিজরীতে আমি আমার চাচা শেখ আবু নাজির আব্দুল কাহের সাহরাওয়ার্দ্দী সহ হজরত বড় পীর শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আমার চাচাজীও একজন বোজর্গ লোক ছিলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম, আমার চাচাজী যতক্ষণ বড় পীর সাহেবের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন, ততক্ষণ মনে হইতে ছিল, তাঁহার যেন কোন অস্তিত্বই নাই, কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত তিনি নীরব—নিশ্চল ভাবে বসিয়া বড় পীর সাহেবের উপদেশ শুনিতে ছিলেন। অতঃপর আমরা হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নেজামিয়া মাদ্রাসার দিকে চলিলাম, পথে যাইতে যাইতে আমি চাচাজীকে কহিলাম, আপনি বড় পীর

সাহেবের দরবারে যাইয়া অমন হইয়া গিয়াছিলেন কেন? একটী কথাও বলিলেন না, কিম্বা একটু নড়াচড়াও করিলেন না? আপনিও ত' একজন শ্রেষ্ঠ বোজর্গ? ইহা শুনিয়া চাচাজী কহিলেন "বাবা পূর্ণ চন্দ্রের নিকট ক্ষুদ্র জোনাকীর বিভা কি বিকাশ পায়? হজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর মারেফাত ও কারামতের জ্যোতিঃ আমাকে নিস্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছিল। খোদা তায়ালা সমস্ত ওলী-আল্লাহকে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাঁহাদের সকলেরই কর্ণধার। তাঁহার নিকটে গেলে আপনই মাথা নত হইয়া আসে। আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া থাকেন, আমরা মানুষ কোন্ ছার।

পীর আবু মোহাম্মদ সরনকী (রঃ) বলিয়াছেন—আমাদের পীর-বোজর্গ শেখ আবুবকর এবনো হাওয়াবা একদিন হজরত বড় পীর সাহেবের সম্পর্কে আলোচনা করিতে করিতে কহিলেন —অচিরে পঞ্চম হিজরীর মাঝামাঝি এরাকে শেখ আবদুল কাদের নামক এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হইবে। তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিধি মানব জ্ঞানের বহির্ভূত। একদিন পৃথিবীর সমগ্র আওলিয়ার স্থান এবং মর্য্যাদার আমি 'কাশ্ফ' করিলাম। দেখা গেল, শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর স্থান সর্ব্বোপরি। ইহার পর আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত মহাপুরুষদের সম্পর্কে কাশফ্ করিলাম—সেখানেও দেখা গেল শেখ আবদুল কাদের জিলানী নেতৃত্ব করিতেছেন। পরম সৌভাগ্য তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীদের। কেয়ামতের দিবস রসুলুল্লাহ

(সঃ) এর উন্নতগণের মধ্যে তাঁহারই মুরিদগণ উচ্চ দরজা প্রাপ্ত হইবেন।

শেখ মুছা এবনো হামান জুলী বলিয়াছেন—শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) যুগ মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। তিনি ওলীদিগের সুলতান, আরেফিনগণের নেতা। খোদার ফেরেশতাগণ যাঁহাকে সম্ভ্রম করিয়া থাকেন, তাঁহার মর্য্যাদা কত অসীম।

বড় পীর সাহেবের অঙ্গুলির আলোকে পথের আঁধার বিদূরিত

শেখ শাদের শারতি বর্ণনা করিয়াছেন—একবার বাগদাদের খলিফা এক বিপুল ভোজের আয়োজন করেন। দেশের সমগ্র আলেম, পীর নিমন্ত্রিত হইয়া সেই ভোজ সভায় যোগদান করিলেন। কেবল হজরত বড় পীর সাহেব, শেখ আদি বিন মোসাফির এবং শেখ আহমদ রফায়ী তাহাতে যোগ দিলেন না। অথচ ইঁহারাই তখন দেশের শ্রেষ্ঠ মান্যবর পীর এবং বিদ্বান। এই তিন জন শ্রেষ্ঠ মানবকে ভোজ সভায় না পাইয়া খলিফা অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ইঁহাদিগকে আনিবার জন্য তাঁর খাস শরীর রক্ষককে পাঠাইয়া দিলেন। খলিফার শরীর রক্ষক হজরত বড় পীর সাহেবের নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে কহিলেন—হে শাদের ! তুমি শীঘ্র 'বাবে হোলবা'

মস্‌জিদে চলিয়া যাও। সেখানে দেখিবে, আদি বিন মোসাফির এবং আরও দুইজন লোক রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আন। আসিবার সময়ে 'শুনিজিয়া' গোরস্তান দিয়া আসিবে। তথায় শেখ আহমদ রফায়ী এবং আরও দুইজন লোক অবস্থান করিতেছেন। ইহাদিগকে আমার নিকটে আসিতে বল। আমি হুজুরের আদেশ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ পাইলাম এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া হুজুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন মগরিবের ওয়াক্ত হইয়াছে। হুজুর ইহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া নামাজে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে খলিফার প্রেরিত লোক আসিয়া কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেল। ইহার পর খলিফা স্বীয় পুত্রকে একখানি পত্রসহ বড় পীর সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। তখন হুজুর আমাকে লইয়া খলিফার দাওয়াত্ রক্ষা করিতে রওয়ানা হইলেন। খলিফার প্রাসাদে ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ দাওয়াত্ গ্রহণ। আমরা তাইগ্রীস নদীর ধারে আসিলে পীর আলি বিন হিতির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল! তিনিও আমাদের সহগামী হইলেন। অতঃপর আমরা খলিফা-সদনে উপস্থিত হইলে একটী সুসজ্জিত কক্ষে নীত হইলাম। তথায় খলিফা এবং তাঁহার পরিচারকগণ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। হুজুর খলিফাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"হে কওমের নেতা! কোন বাদশাহ কোন প্রজার গৃহে পদার্পণ করিলে সে তাঁহার চলার পথে মখ্‌মল্ এবং রেশমী কার্পেট বিছাইয়া দিয়া থাকে।" ইহা শুনিয়া খলিফা নিজের মূল্যবান

পরিধেয় বস্ত্রের একপ্রান্ত গৃহ প্রাঙ্গণে বিছাইয়া দিয়া কহিলেন —"হুজুর এবং হুজুরের সঙ্গীগণ ইহার উপর দিয়া অতিক্রম করুন। আপনাদের পদধূলি স্পর্শে আমি গৌরবান্বিত হই।"

অতঃপর খলিফার দাওত্ রক্ষা করিয়া আমরা সদলে বিদায় গ্রহণ করিলাম। হুজুর আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এমাম্ আহমদ বিন্ হাম্বল (রঃ) এর গোর জিয়ারত করিতে চলিলেন। রাত্রি খানিকটা হওয়ায় অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল। নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমরা কি করিয়া ঐ দুর্গম পথ চলিব, ইহাই ভাবিতে ছিলাম। হুজুর আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন। আমরা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম—হুজুর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের শাহাদাৎ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহার সেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে মশালের ন্যায় আলো বাহির হইয়া পথ আলোকিত করিতেছে। জেয়ারত সমাপ্ত করিয়া আমরা আবার ঐ ভাবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আজম-বাহিনী বাগদাদ আক্রমণ করিতে আসিয়া বড় পীর সাহেবের ভয়ে প্রস্থান

একবার আজম দেশের কোন এক বাদশাহ বাগদাদ আক্রমণের জন্য এক বিপুল সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার মত শক্তি

বাগদাদের খলিফার ছিল না। তিনি হজরত বড় পীর সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। বড় পীর সাহেব শেখ আলি বিন হিতিকে ডাকিয়া কহিলেন—"তুমি এক্ষুণি আজম বাহিনীর শিবিরে যাইয়া তাহাদের সেনাপতিকে বলিবে, তাহারা যেন শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করে।" শেখ আলি বিন হিতি নিজে তথায় না গিয়া তাঁহার একজন খাদেমকে ডাকিয়া কহিলেন—"আজমীরা যেখানে অবস্থান করিতেছে, তুমি শীঘ্র তথায় চলিয়া যাও, তুমি তথায় গেলে দেখিতে পাইবে, একস্থানে একটী তাঁবুর মধ্যে তিন ব্যক্তি বসিয়া আছে, তাহাদিগকে বলিবে, আলি বিন হিতি তোমাদিগকে এক্ষুনি বাগ্‌দাদ ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন। তাহারা যদি বলে আমরা অন্যের আদেশ ক্রমে আসিয়াছি, সুতরাং তাঁহার আদেশ না পাইলে আমরা চলিয়া যাই কি করিয়া। তখন তুমিও বলিবে, আমিও অন্যের আদেশে তোমাদের নিকট আসিয়াছি।" খাদেম নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া ঐ কথা তাহাদিগকে বলিলে তাহারাও ঐ ভাবে প্রত্যুত্তর দিল বটে, কিন্তু তাহাদের মনে কি এক অজ্ঞাত ভয়ের সঞ্চার হইল। তখনই তাহারা তাঁবু গুটাইয়া সদল বলে স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

অপর এক পীরের শিষ্যকে বড় পীর সাহেব এল্‌মে মারেফাত্‌ শিক্ষা দেন

শেখ্‌ আবু মোহাম্মদ সালেহ বর্ণনা করিয়াছেন—আমার পীর শেখ আবু মাদায়েন একদিন আমাকে কহিলেন—হে আবু সালেহ! তুমি বাগদাদে যাইয়া গওসল আজম হজরত শেখ আবতুল কাদের জিলানীর (রঃ) নিকট কিছুদিন এলমে-বাতেনী শিক্ষা কর। তদনুসারে আমি বাগদাদে আসিয়া হজরত বড় পীর সাহেবের খেদমতে উপনীত হইলাম। হুজুর আমাকে ২০ দিন এক নির্জ্জন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহার পর তিনি আমাকে তথা হইতে বাহির করিয়া কহিলেন—"সালেহ! তুমি কেব্‌লার দিকে নজর কর।" আমি তাহাই করিলাম। তখন হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিতে পাইতেছ?" আমি কহিলাম—"কাবা' শরীফ্‌ দেখিতে পাইতেছি।" অতঃপর তিনি আমাকে পশ্চিমের দিকে দৃকপাত করিতে হুকুম করিলেন। আমিও সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিতে পাইতেছ?" আমি কহিলাম—"আমার পীরকে দেখিতে পাইতেছি।" তখন হুজুর কহিলেন—"এখন তুমি কোথায় যাইতে চাও? কাবা শরিফে না তোমার পীরের নিকট?"

—"আমি পীরের নিকট যাইতে চাই হুজুর।"

—"আচ্ছা, তুমি এক পাদবিক্ষেপে যাইতে চাও, না যে ভাবে আসিয়াছিলে, ঐ ভাবে যাইতে চাও?"

—"আমি যে ভাবে আসিয়াছিলাম ঐ ভাবে যাইতে চাই হুজুর।"

অতঃপর হুজুর আমাকে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। ইহার পর হইতে আমি মারেফাতের বহু গুপ্ত-রহস্য জ্ঞাত হইলাম।

শেখ মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে বড় পীর সাহেবের অভিমত

পীর হোসেন মনসুর হাল্লাজ "আনাল্-হক্" অর্থাৎ আমি খোদা এই আপত্তিকর জেকের করিতে থাকিলে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তৎকালীন 'ওলামা' সমাজের ফতোওয়া লইয়া খলিফা তাঁহার প্রতি চরম শাস্তির ব্যবস্থা করেন। হাফেজ মোহাম্মদ বিন রাফে' তাঁহার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—হজরত বড় পীর সাহেবকে মনসুর হাল্লাজ সংক্রান্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—হাল্লাজের দাবীর পাখ্না এতদূর লম্বা হইয়া গিয়াছিল যে, শরিয়তের কাঁচি দিয়া উহা ছাটিয়া খাটো করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

শেখ ওমর বাজ্জাজ বলিয়াছেন—আমি আমার পীর হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর নিকট শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন—"হোসেন মন্সুর হাল্লাজ ভীষণভাবে পদস্খলিত হইয়াছিল। তাহার হাত ধরিয়া তুলিবার মত সেই জামানায় এমন কোন লোক ছিল না, আমি সেই যুগে হইলে কিছুতেই তাহাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবিয়া যাইতে দিতাম না।"

বড় পীর সাহেবের মুরিদগণের সৌভাগ্য

শেখ আবদুল ফাতাহ হের্‌রী বলিয়াছেন—মুরিদগণের পক্ষে শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর মত পীর পৃথিবীতে আর হইতে পারে না।

শেখ আবু সাঈদ কায়লুবী বর্ণনা করিয়াছেন—শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর আঁচ্‌লা যে ব্যক্তি ধরিয়াছে, সেই মুক্তি পাইবার অধিকারী হইয়াছে।

শেখ আলি বিন্‌ হিতি বর্ণনা করিয়াছেন—হজরত বড় পীর সাহেবের মুরিদ ও ভক্ত অনুরক্তদিগকে আমি মুক্তি-প্রাপ্ত লোকদিগের দলে দেখিয়াছি। একব্যক্তি বড় পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হুজুর, আপনার মুরিদগণের মধ্যে পরহেজগার এবং গোণাহ্‌গার দুই শ্রেণীর লোকই ত' থাকিবে। তখন হুজুর বলিয়াছিলেন—আমার জন্য পর্‌হেজ্‌গারগণ, আর গোণাহ্‌গারদের জন্য আমি।

শেখ আদি বিন্‌ আবুল বরাকাত বলিয়াছেন—আমি আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, পীর আদি বিন মোসাফির প্রায়ই বলিতেন—কোন পীরের কোন মুরিদ আমার নিকট খেরকা পরিধান করিতে চাহিলে আমি তাহাকে খেরকা পরিধান করাইব, কিন্তু কেবল শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর কোন মুরিদকে আমি খেরকা পরিধান করাইব না। কারণ মহাসিন্ধুর কাছে ক্ষুদ্র নালা-নর্দ্দামার কি মূল্য থাকিতে পারে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রদীপ নিভিল

সংসার অনিত্য, মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী—পদ্মপত্রে পানির মতই সদা টলটলায়মান। আজ হয়তো যিনি পুষ্প-বিথানে প্রস্ফুটিত গোলাপ-মল্লিকার ন্যায় সৌরভ বিতরণ করিতেছেন, কাল হয়তো তাঁহাকে কালের ঝড়ো হাওয়ায় ধূলী-মলিন ভূমিতলে ঝরিয়া পড়িতে হইবে। নবী বল, পায়গম্বর বল, ওলী বল, গওস বল, আবদাল বা কুতব্ বল, কাহাকেও কালের নিষ্ঠুর হস্ত রেহাই দিবে না। যে মালাকুল মওতের হস্তে কোটী কোটী জীবের প্রাণ, তাঁহাকেও একদিন মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতে হইবে। সৃষ্টিরাজ্যে একটী প্রাণীকেও মৃত্যু ক্ষমা করিবে না।

তবে তোমার আমার মৃত্যু আর সাধু মহাপুরুষদের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান আকাশ পাতাল। তাহাদের মৃত্যু শুধু স্থান পরিবর্ত্তন—প্রেমাস্পদের শান্ত-শীতল ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার এক শুভক্ষণ। তাই রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন—"আল্ মওতো জছ্রুন্ ইউসেলোল্ হাবীবা এলাল্ হাবীবে।"—পরপারে বন্ধুর সহিত মিলিত হইবার পক্ষে মওত্ একটী সেতু বিশেষ। সুতরাং যে মহামানবের অমর-স্মৃতির কূলে দাঁড়াইয়া আজ আমরা তাঁহার মৃত্যুর ঘটনা বিবৃত করিতে যাইতেছি, ইহাকে মৃত্যু বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ইহা গৌরব রেহ্লাত।

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি—৫৬০ হিজরীর শাবান মাসের শেষ দিনে রম্‌জান মাস এক পরমাসুন্দর যুবকের আকৃতিতে হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট আসিয়া কহিল—"হুজুর, আমি আপনার নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছি। আর কোন দিন আপনার কাছে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিব না।" বড় পীর সাহেব বেশ বুঝিলেন, এই কথার মধ্যে তাঁহার মৃত্যুর ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের অন্তরে সর্ব্বদা খোদার সহিত মিলিত হইবার আকুল আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, তাঁহারা মরণের দূত দেখিয়া—মরণের ইঙ্গিত শুনিয়া বিচলিত হইবেন কেন? তিনি আনন্দোৎফুল্লমনে খোদার দরগাহে হাজার শুক্‌রিয়া আদায় করিলেন, এইবার মাহ্‌বুব তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, ইহাপেক্ষা প্রতীক্ষিত প্রেমিকের পক্ষে আর কি সুসংবাদ হইতে পারে!

৫৬১ হিজরীর রবিওসসানির প্রথম হইতে হজরত বড় পীর সাহেব ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। দিন দিন তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, অসীমের পথে মহাযাত্রার দিন আর বেশী বাকী নাই। এই সময়ে হুজুরের পুত্র শেখ আবদুল ওহাব্ কহিলেন, "পিতঃ আমাদিগকে অন্তিম উপদেশ দিন।" হুজুর বলিলেন, "বৎস, সর্ব্বদা খোদাকে ভয় করিয়া চলিবে, তাঁহার এবাদাতে কোন দিন অবহেলা করিও না। একমাত্র খোদাকেই ভয় করিবে, এবং তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবে, যাহা তোমার অন্তরের কামনা বাসনা থাকে, একমাত্র খোদার নিকট তাহা পেশ করিও।"

এই সময়ে ফেরেশতা, নবী এবং ওলীদের আত্মাসমূহ হুজুরের নিকট শেষ বিদায় জানাইতে আসিল। হুজুর তখন শয্যা পার্শ্বস্থ লোকদিগকে অন্য ঘরে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন—"তোমরা এখন এই স্থান হইতে চলিয়া যাও, মনে করিও, এখন তোমাদের এবং আমার ভিতর স্বর্গ এবং পাতালের ব্যবধান।"

এন্তেকালের রাত্রিতে হজরত বড় পীর সাহেব পুত্রগণকে কহিলেন, "বাবা আমাকে গোসল করাইয়া দাও।" তাঁহারা তাঁহার এই অন্তিম আদেশ পালন করিলে, হুজুর জীবনের শেষ গোসল করিয়া ঈশার নামাজ পড়িলেন। অতঃপর সিজ্‌দায় মাথা রাখিয়া তিনি খোদার নিকট আত্মীয়-পরিজন, মুরিদ-মোতাকেদ এবং সাধারণ মুসলমানের কল্যান কামনা করিলেন। তিনি সিজ্‌দা হইতে মাথা তুলিলে দৈববাণী হইল—"হে শান্তিপূর্ণ আত্মা! খোদার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর। তুমি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আমার বান্দাগণের মধ্যে পরিগণিত হও এবং বেহেশতে প্রবেশ কর"—(কোরআন)। এই সময়ে হুজুর তাঁহার মৃত্যু-পাংশু ওষ্ঠদ্বয় নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমি খোদার সাহায্য এবং অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। তিনিই একমাত্র বন্দেগীর উপযুক্ত,এবং তিনি অনাদি—অনন্ত। তিনি পবিত্র এবং শক্তিশালী, মৃত্যু তাঁহারই নিকটের আবাহন। তিনি আল্লাহ সর্ব্বশক্তিময় আর হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায় অসাল্লাম তাঁহারই প্রেরিত নবী।

আরবীয় পোষাকে মালাকুল্ মওতের আগমন

ইত্যবসরে হজরত আজরাইল (আঃ) আরবীয় আকৃতিতে একখানি চিঠি হস্তে হুজুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। চিঠিখানিতে আরবী অক্ষরে এই কয়টী কথা লেখা ছিল—

"মেনাল মোহেব্বে এলাল্ মাহ্ বুবে—কুল্ল নাফ্ ছিন জায়েকাতল মওত্।"

অর্থাৎ "প্রেমাস্পদ হইতে প্রেমিকের নিকট—প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে।" এই সময়ে হুজুর তিনবার আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অমর আত্মা অসীম পরপারের পথে চলিয়া গেল। ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলাহে রাজেউন।

৫৬১ হিজরীর (১১১৬ খৃঃ অঃ) ১১ই রবিওস সানি সোমবার অতি প্রত্যূষে ইসলামের সূর্য্য, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সূর্য্য—দজ্লারকূলে চির অস্তমিত হইল।

প্রভাত হইল। কিন্তু আজিকার প্রভাত কারবালার শোক শিহরণ লইয়া আসিয়াছে। সূর্য্য উঠিতেই উদয় তোরণের যবনিকার অন্তরালে মুখ ঢাকিল। কি এক শিথিল সৌন্দর্য্য সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ছাইয়া ফেলিল। ফোরাত কারবালার দৃশ্য দেখিয়াছে, আজি দাজ্লও বাগ্দাদের মাতম্-দৃশ্য দেখিল। বাতাস মর্ম্ম গুঞ্জনে জানাইয়া গেল--গওসল্ আজম—বিশ্ব-মুসলিমের বড় আদরের গওসল আজম—আরব-আজমের দুলাল—বড় পীর সাহেব আর নাই! আরবের প্রতি মরু-

কণা হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল—বিশ্ব মুসলিম ধর্ম্ম জগতে আজ যথার্থই 'এতিম' হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া—ঘরে ঘরে মাতম্ ধ্বনি শুনিয়া মেঘের চক্ষু ফাটিয়া রক্ত অশ্রু ঝরিল। দজ্লার মর্ম্মকেন্দ্রে শোকের রক্ত প্রবাহ ছুটিল।

পঙ্গপালেরও একটী সীমা আছে কিন্তু মানুষের কি সে সীমা নাই? নিকটে—দূরে চারিদিক হইতে লোকে আত্মহারা, উদ্‌ভ্রান্তের মত বাগদাদের দিকে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে বাগদাদ নগরী জন সমুদ্রে পরিণত হইল। সকলেরই চোখে দরবিগলিত অশ্রু। সকলেরই বুকে শোকের মরু-দাহন। সকলেরই মুখে ব্যথার সুস্পষ্ট ছায়া। শিশু হইতে বৃদ্ধ, পুরুষ হইতে নারী সকলেরই সমান অবস্থা। খলিফা হইতে দীনহীন ফকীর পর্য্যন্ত সকলরেই মনের অবস্থা এক।

জ্যেষ্ঠপুত্র পীরজাদা শেখ আব্দুল ওহাবের এমামতে জানাজা সম্পন্ন হইল। ইসলামের রবি চিরদিনের জন্য "বাবুল আজাজ্" এর মৃত্তিকার নিম্নে মুখ লুকাইল। এই সময়ে হজরত বড় পীর সাহেবের বয়স ৯২ বৎসর।

বাগদাদের মাটীতে যে অনবদ্য রত্ন সমাহিত হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহার অমর-স্মৃতি কোনদিন মুছিবে না। তাই মহানগরী বাগদাদ বিশ্ব-মুসলিমের পুণ্যময় তীর্থকেন্দ্র। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মুসলমান পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে এই পুণ্যময় স্থানে সমবেত হইয়া তাহাদের শোক-অশ্রু নিবেদন করিয়া থাকে।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হজরত বড় পীর সাহেবের বংশধরগণের গতি-পরিণতি

কাহারো কাছে হয়তো তোমার আমার প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু যিনি নিজেই দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাইয়াছেন, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে কি করিয়া? খোদাতায়ালা যাহাকে নিজের কাছে ডাকিতেছেন, তুমি তাঁহাকে কোন্ শক্তির বলে ধরিয়া রাখিতে পার?

বড় পীর সাহেব চলিয়া গিয়াছেন। কোটী কোটী মুসলমানের কামেল মুরশিদ—ধর্ম্ম জগতের শাহনশাহ্ বড় পীর চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ, তাঁহার বিশ্ব বিশ্রুত মাদ্রাসা, মোসাফির খানা, কোটী কোটী মুরিদ মোতাকেদ্, অসংখ্য কৃতবিদ্য কামেল শিষ্য ও খলিফা, এবং শরিয়ত ও মারেফাতের খাজিনা স্বরূপ কয়েকখানি অমূল্য কেতাব।

পুণ্য ভূমি বাগদাদে সর্ব্ব প্রথম যে স্বর্গীয় আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহার বিমল ছটা মক্কা, মদিনা, প্যালেষ্টাইন, মিসর, এয়মন, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, জাভা, ফিলিপাইন, মরক্কো, আফগানিস্তান, পারস্য প্রভৃতি দেশ সমূহকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হজরত বড় পীর সাহেবের সন্তান সন্ততির সংখ্যা ছিল মোট ৪৯টী, তন্মধ্যে ২৭টী পুত্র ২২টী কন্যা। হুজুরের মৃত্যুর পর বহুদিন যাবত ইহারা সকলেই বাগদাদ ভূমিতে বসবাস করেন। কিন্তু কালের ঘূর্ণি প্রবাহ চিরদিন তাঁহাদিগকে একই স্থানে অবস্থানের সুযোগ দিল না। কালের দুর্ব্বার আবর্ত্তনে পড়িয়া তাঁহাদের অনেকেই পৃথিবীর নানা খণ্ডে ছড়াইয়া পড়েন। শাহ ইসমাইল সুলতানুল আজম যখন বাগদাদের খলিফা, সেই সময়ে সম্মানিত জিলানী পরিবারে ভাঙ্গন শুরু হয়। খলিফা ইহাদিগকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার অপ্রীতিকর ব্যবহারে ইহারা অনেকেই বাগদাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর সুলতান সোলে-মান বাগদাদের শাসন ভার গ্রহণ করিলে তিনি হজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর (রঃ) বংশ এবং পরিবারবর্গকে আবার নূতন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় হুজুরের বংশধরগণের কেহ কেহ বিদেশ হইতে বাগদাদে আসিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

বড় পীর সাহেবের বংশধরগণ যে যে দেশে গিয়াছেন, সেই সেই দেশবাসী কর্ত্তৃক তাঁহারা বিপুল ভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। যাহারা ভ্রান্তি কিম্বা ক্ষমতার বসে তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, তাহারাই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। শুনা যায় নস্থু নামক এক শাসন কর্ত্তা বড় পীর সাহেবের আওলাদের উপর অত্যাচার করায় সে সবংশে নিহত হইয়াছিল। এক সময়ে এবনো ইউনোসের উজির নাসিরউদ্দিন বাগদাদ হইতে এই

পীর পরিবারকে নাকি নির্ব্বাসিত করেন। ইহার প্রতিফল তিনি হাতে হাতে পাইয়াছিলে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনি এবং তাঁহার সমগ্র পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। বড় পীর সাহেবের একটী কবিতায় আছে—

"অ নাহনো লেমান্ কাদ্ ছায়ানা ছাম্মন কাতেলুন
ফা মান্লাম্ আস্দোকো ফালইউজব্বেরব্ অ এয়'তাদী"

অর্থাৎ—যে আমার বংশধরের প্রতি জুলুম করিবে, আমি তাহার পক্ষে মারাত্মক বিষ সদৃশ। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।

হজরত বড় পীর সাহেবের এন্তেকালের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার গদ্দীনেশিন হইয়া ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতার আদর্শ, শিক্ষা এবং রীতিনীতি পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকেন্। হুজুরের অসংখ্য মুরিদ মোতাকেদকে শিক্ষা দান, তাঁহার বড় সাধের মাদ্রাসাটীর পরিচালনা তাঁহার যোগ্য হস্তেই করিতে লাগিলেন।

প্রায়ই দেখা যায়, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা অনেকেই বুঝিতে পারে না। সেইরূপ মানুষ মরিয়া না গেলে তাঁহার প্রকৃত অভাব বুঝিতে পারা যায় না, যখন তাঁহার শূন্য স্থানের দিকে নজর পড়ে, তখনই মনে হয় তিনি কি ছিলেন। বড় পীর সাহেব যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন যাহারা তাঁহাকে চিনে নাই, কিংবা চিনিবার প্রয়োজন মনে করে নাই, তাহারা এন্তেকালের পর তাঁহাকে

চিনিতে পারিল। তাই হতাশ মনে তাহারা ছুটীল বাগদাদের পানে—যে স্থানে ইস্‌লামের বাদ্‌শাহ—মুসলমানের অন্তরের বাদশাহ শান্তির নিদ্রায় ঘুমিয়া আছেন, আর তাহারা আত্মদান করিতে লাগিল তাঁহার সুযোগ্য পুত্ররত্নের পায়ে। এই ভাবে বাগ্‌দাদে কাদেরিয়া তারিকার অনুসরণকারিদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে কাদেরিয়া তরিকার প্রসার

পীরত্বের তরিকা চারিটী—যথা কাদেরিয়া, চিশতিয়া মোজ্জাদ্দেদিয়া ও নকশবন্দিয়া। প্রত্যেক তারিকার উদ্ভাবক এক একজন প্রখ্যাতনামা পীর। চিশতিয়া তরিকার উদ্ভব খাজা মঈন্‌উদ্দীন চিশতী (রঃ) হইতে, মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সূত্রপাত হয় হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি হইতে। নক্‌শ-বন্দিয়া তারিকা জন্ম লাভ করে হজরত বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দি হইতে, আর কাদেরিয়া তরিকার মূলসূত্র আমাদের গওসল আজম হজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী(রঃ)। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মুসলমান এই কাদেরিয়া তরিকার অনুসরণ করিতেছে।

তরিকা আর কিছুই নহে, মারেফাতের মহাসাগরে মিশিবার একটী পথ। সামান্য একটু বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই পথ গঠিত হইলেও ইহাদের মিলন-ক্ষেত্র এক। বিভিন্ন দেশে কাদেরিয়া

তরিকার উৎপত্তি এবং ইহার ক্রমঃ বিকাশ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার কিছু পরিচয় পাঠকবর্গের সম্মুখে পেশ করিতেছি।

বড় পীর সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁহার কতিপয় প্রখ্যাত-নামা কামেল শিষ্য পীরত্ব লাভের গৌরব অর্জ্জন করেন। ইঁহাদের কয়েক জনের পরিচয় আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সহৃদয় পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ইঁহারা এরাক্, এয়মন, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে বিপুলভাবে সমাদর লাভ করেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাদের নিকট শরিয়াত্ মারেফাত প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হয়। এয়মনের কাদেরিয়া তারিকার প্রথম উৎপত্তি লাভ করে—বড় পীর সাহেবের অন্যতম খলিফা পীর আলী এবনে হাদ্দাদ দ্বারা। ইনি যেমন একজন অসাধারণ কামেল পীর ছিলেন, ফেকাহ ও হাদিস শাস্ত্রেও তেমনি তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। পীর আবু আব্দুল্লাহ আল-বাতায়েহী সিরিয়ায় কাদেরিয়া তরিকার শিক্ষাদাতা ছিলেন। হজরত আবুবকর আবদুল আজিজ নামক বড় পীর সাহেবের এক পুত্র 'জবল' নামক স্থানে অবস্থান করিতেন, তথায় তিনি এই তরিকার প্রচলন করেন। এতদ্ব্যতীত দামেশক, সান্আ, তুরস্ক ও মরক্কো প্রভৃতি দেশেও এই ভাবে কাদেরিয়া তরিকার প্রচলন হয়। এমাম আবু ওমরু ওসমান কারশি নামক মিসরের এক অপ্রতি-দ্বন্দ্বী আলেম ও ফকিহ আরাফাতের ময়দানে বড় পীর সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে খেরকা পরিধান করেন। ইনিই মিসরে কাদেরিকা তরিকার প্রথম প্রচলনকারী।

অধিকন্তু ইনি ধর্ম্ম প্রচারকরূপে ত্রিপলী, তিউনিস্ প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া তথাকার লোকদিগকে এই মতে দীক্ষিত করেন।

বড় পীর সাহেবের অন্যতম পুত্র হজরত শেখ আবদুল ওহাব্। তাঁহারই সুযোগ পুত্র সৈয়াদ মোহাম্মদ গওস জিলানী ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে হলব্ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন সেকেন্দ্রার লোদী দিল্লীর সম্রাট, তিনি সর্ব্ব প্রথম তাঁহার নিকট মুরিদ হইলে চারিদিকে এক চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়, বহু নর-নারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এমন কি অনেক হিন্দুও ঐ সময়ে তাঁহার নিকট তওবা করিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। পাঞ্জাবের কোন এক স্থানে এই মহাপুরুষের মাজার এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

লাহোরে আর একটী মহাপুরুষের মাজার রহিয়াছে। ইঁহার নাম পীর আবু মাওয়ালী আল্-কাদেরী, ইনি কাদেরিয়া তরিকার একজন জবরদস্ত ওলী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী ছাড়াইয়া পড়ে যে, যিনি তাঁহার নিকট মুরিদ হইবেন, তিনি সেই রাত্রিতেই স্বপ্নযোগে হজরত রসুলে করিম (সঃ) এর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিবেন। এই ভাবে প্রলুব্ধ হইয়াও বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান 'শিয়া' মতাবলম্বিনী ছিলেন, রাজ্যের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ছিল অসীম, সুতরাং সম্রাজ্ঞীর চেষ্টায় 'শিয়া মতের প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল। সম্রাট জাঁহাগীরের উপরও ইহার প্রভাব পতিত হয়। এই সময়ে

পীর মিয়া মীর নামক কাদেরিয়া তরিকার একজন অসামান্য শক্তিশালী দরবেশের প্রচেষ্টায় তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সম্রাট এই দরবেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটী উপহার প্রদান করেন। কিন্তু যিনি মারেফাতের-সুধা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, তিনি অর্থ সম্পদের পিয়াসী হইবেন কেন? তিনি সম্রাটের দান ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক সত্যের আলোক প্রাপ্ত হইল। শাহ নাথান কাদেরী নামক তাহার এক খলিফা ছিলেন। ইনি অতি নীচবংশোদ্ভূত এবং সম্পূর্ণ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও দরবেশ সাহেবের শিক্ষার গুণে এবং সাহচর্য্যের কল্যানে ইনি অশেষ কামালিয়াত লাভ করেন। শুনা যায়, তাঁহার সহিত বৃক্ষলতা, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি জড় পদার্থও নাকি কথা বলিত। লাহোরে কাদেরিয়া তরিকার আর একটী পীরের মজার রহিয়াছে, এই পীর সাহেব হিরাট হইতে সম্রাট হুমায়ুনের সহিত ভারতে আগমন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস্ মওলানা আবদুল হক দেহলবীও কাদেরিয়া তরিকার স্বনামধন্য পীর ও ওলী ছিলেন, তাঁহার দ্বারাও দিকে দিকে এই তরিকার প্রসার প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম কাহার দ্বারা এবং কোন্ সময়ে কিভাবে কাদেরিয়া তরিকার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই, বাংলার বহু পীর কাদেরিয়া তরিকা মতে জেকর-আজকার শিষ্য

দিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মেদিনীপুরের পরলোকগত স্বনামধন্য পীর শাহ মোর্শেদ আলী সাহেব বাংলায় কাদেরিয়া তরিকার প্রভূত প্রসারতা বৃদ্ধি করেন। এখনও তাঁহার অসংখ্য শিষ্যগণ ঐ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ফুরফুরার বঙ্গ বিখ্যাত পীর সাহেব মরহুম ও তাঁহার খলিফাগণ অন্যান্য তরিকাগুলির সহিত কাদেরিকা তরিকারও পীর। বাংলায় কাদেরিয়া তরিকার সূত্রপাত সম্বন্ধে ইতিহাসে যে ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে এখানে বিবৃত হইতেছে।

পাঠকগণ এই পুস্তকের ১০২ পৃষ্ঠায় পীর শেহাবুদ্দিন সাহরাওয়ার্দ্দীর বিচিত্র জন্ম বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন, বড় পীর সাহেবের দোওয়ার বরকতে তিনি কন্যা হইতে পুত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। ইনি কালে যে একজন নামজাদা ওলী হইবেন সেই সম্বন্ধে বড় পীর সাহেব তাঁহার জন্ম মুহূর্ত্তেই ভবিষ্যদ্বাণী করেন। বড় পীর সাহেবের জীবদ্দশায়ই ইনি পীরত্ব লাভ করিয়া হুজুরের নিকট খেরকা পরিধান করিয়াছিলেন।

পীর শেহাবুদ্দিনের এক বিশিষ্ট খলিফা পীর জালালুদ্দিন তব্‌রেজী মুলতানে আগমন করেন। তথায় তাঁহার এক পীর ভাই থাকিতেন। কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া পীর জালালুদ্দিন দিল্লীতে উপস্থিত হয়েন। তারপর আসিলেন —সিন্ধু দেশের অন্তর্গত বাদাইউনে। বাদাইউনের কাজী সাহেব এক রাত্রি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন—নবাগত পীর সাহেব

'আরশে আজিম' এর উপর নামাজ পড়িতেছেন। ইহাতে তিনি পীর সাহেবের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পীর জালালুদ্দিন তথায় এমন করামত দেখাইতে থাকেন, যে বহু হিন্দুও তাঁহার নিকট ইসলাম গ্রহণ করে। এক লক্ষপতি হিন্দু গোয়ালাও ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া শেখ আলী নাম ধারণ করেন। শেখ আলী পীর জালালুদ্দিনের এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজের বিশাল ঐশ্বর্য্যবৈভব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পীর সাহেবের খেদমতে পড়িয়া থাকিতেন।

একদিন পীর জালালুদ্দিন তব্‌রেজী স্বপ্নযোগে জানিতে পারিলেন—খোদা তাঁহাকে বাংলা দেশে যাইয়া ইসলাম প্রচার ও গোমরাহী দূর করিতে আদেশ করিতেছেন। তদনুসারে তিনি বাংলাদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহা দেখিয়া আলী কাঁদিয়া ব্যাকুল। তিনি কহিলেন—হুজুর ! এঅধমকেও আপনার সঙ্গী করিয়া লউন, আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে পারিব না।" পীর জালালুদ্দিন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"বাবা আমি বাংলায় একাকী যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি, তা-ছাড়া তুমি এই স্থানের কোতব্‌ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, সুতরাং এই স্থানে তোমার উপস্থিতির খুবই প্রয়োজন রহিয়াছে, তুমি বিচলিত হইও না, যে মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে দেখিবার বাসনা কর, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে।"

তখনকার দিনের অতি দুর্গম পথে পীর জালালুদ্দিন

তব্রেজী বাংলাভিমুখে রওয়ানা হইলেন, সঙ্গে লোক নাই, অর্থ নাই, অস্ত্র নাই। খোদার অনুগ্রহ তাঁহার একমাত্র সম্বল—যাত্রা পথের সহায়। দীর্ঘদিন অবিশ্রান্ত পথ চলার পর তিনি মালদহের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌড়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। গৌড়ে তখন হিন্দু-প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তথায় কোন মুসলমান পদার্পণ করিতে পারিত না। গৌড়ে একটী বিরাট হিন্দু মন্দির ছিল, তথায় বহু সংখ্যক মোহান্ত-সন্ন্যাসী বাস করিত, তা-ছাড়া দেশ দেশান্তর হইতে বহু হিন্দু এখানে তীর্থ দর্শনে উপস্থিত হইত।

লীলাময়ের বিচিত্র-লীলা বুঝিবার শক্তি কাহার আছে? তিনি কখন কাহার দ্বারা কি ভাবে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করান, তাহা কে বুঝিতে পারে? চারিদিকে জাগ্রত জনমত, সাঁঝ সকালে কাঁসর ঘণ্টার তুমুল নিনাদ, তার উপর যুগ-যুগান্তর হইতে মোহান্ত-সন্ন্যাসীদের মনে বদ্ধমূল সংস্কার, সুতরাং এই অবস্থায় পীর জালালুদ্দিন একাকী এতবড় এক বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তথায় কি করিয়া তিনি ইস্লামের জয়-কেতন উড্ডীন করিবেন? কিন্তু খোদা যাহার সহায়, সত্যের 'জুল্ফাক্কার' যাহার হস্তে, তাহার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিবে এমন সাধ্য ও দুঃসাহসিকতা কাহার আছে?

পীর জালালুদ্দিন উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে কিম্বা তরুতলে নিশা যাপন করেন, বৃক্ষের পাতা কিম্বা ফল মূল খাইয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করেন। কিন্তু তাহাতেও বাধার সৃষ্টি হইল, সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত মোহান্ত-রাজ্যে একজন মুসলমানকে

দেখিয়া তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা নানাভাবে পীর জালালুদ্দিনকে অনিষ্ট এমন কি প্রাণনাশেরও চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পীর সাহেব আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তিনি এমন সব কারামত্ দেখাইতে লাগিলেন, যাহা মোহান্ত-সন্ন্যাসীদের মনের উপর ভীষণ প্রভাব বিস্তর করিল। দেখিতে দেখিতে সত্যের জয় হইল, অসত্যের দুর্গ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মন্দিরের যত পূজারী সাধু-সন্ন্যাসী, মোহান্ত ছিল একদিন হঠাৎ তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল। 'আল্লাহো আকবর' জয়ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত হইল। কিছুদিনের মধ্যেই মন্দিরটীর নাম নিশানা থাকিল না, তাহার অদূরে গড়িয়া উঠিল আকাশচুম্বী মিনারা বিশিষ্ট এক বিরাট মসজিদ। শুনা যায় এই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ পীর জালালুদ্দিন তব্রেজীর মাজার কামরূপে রহিয়াছে। ইতিহাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে, হজরত বড় পীর সাহেবের সুযোগ্য পুত্র, সাধু-প্রবর হজরত শেখ আবদুর রাজ্জাক (রঃ) এর বিশিষ্ট খলিফা হজরত জাকের আলী অল-কাদেরী ঐশ-প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১১৪০ হিজরীতে এই মহাপুরুষ বাংলায় আসিয়া বর্দ্ধমান জেলার "মোগল কোট" নামক স্থানে উপনীত হয়েন। তাঁহারই পরবর্ত্তী খলিফা মেদিনীপুরের খ্যাতনামা পীর শাহ মোর্শেদ আলী মরহুম সাহেব।

এইভাবে হজরত বড় পীর সাহেবের ভক্ত-অনুরক্ত এবং বংশানুক্রমিক মুরিদ মোতাকেদ বিশ্বের সর্ব্বকেন্দ্রে বিস্তৃত

রহিয়াছেন। তাঁহার তরিকা অনুসরণকারিগণ ইসলামের খাঁটী সেবক। বড় পীর সাহেবের "মহীউদ্দিন" খেতাবের সার্থকতা যে কত অভূতপূর্ব্বভাবে রক্ষিত হইয়াছে, দীন ইসলাম তাঁহার দ্বারা কতখানি সঞ্জীবিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার কাণে গেল। সহসা তাঁহার মনের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"এবনো হাওয়ারা! তুমি মানুষ, তুমি শক্তিহীন মানুষ, তবুও লোকে তোমার ভয়ে ও ত্রাসে কম্পিত, কিন্তু যে খোদা সমস্ত শক্তির মালিক, যাঁহার সামান্য ফুৎকারে তোমার ন্যায় কত সহস্র হাওয়ারা তৃণের ন্যায় উড়িয়া যায়, তাহাকে তুমি ভয় না করিয়া সর্ব্বদা পাপকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছ।" এবনো হাওয়ারার মনে বিবেকের কষাঘাত জাগিল। তিনি চিন্তা করিতে বসিলেন, সত্যি তিনি এতকাল ভীষণ অন্যায় পথে কাল কাটাইতেছেন, কিন্তু আর না!

তিনি কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার চোখের অশ্রুতে যুগ-যুগান্তরের পাপ কালিমা বোধ হয় ধুইয়া মুছিয়া গেল। রাত্রিতে তিনি ঘুমাইয়াছেন, সহসা এমন সময়ে স্বপ্নে দেখিতেছেন—দোজাহানের মানব-মুকুট হজরত রসুলে আক্‌রম (সঃ) এবং ইসলাম জগতের প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রঃ) তাঁহার শিয়রদেশে সমুস্থিত। এবনো হাওয়ারা তাঁহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন—হে রসুলে মক্‌বুল! আপনি আমাকে খেরকা পরাইয়া দিন। হজরত রসুলে করীম (সঃ) তাঁহাকে কহিলেন—"হে এবনো হাওয়ারা, আমি তোমার নবী, আবুবকর তোমার অগ্রণী। তাঁহার নামের সহিত তোমার নামের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। তিনিই তোমাকে খেরকা পরিধান করাইবেন।" হজরত আবুবকর এবনো হাওয়ারার গায়ে একটী জামা ও মাথায় টুপী পরাইয়া দিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইল, স্বপ্ন টুটিল, এবনো হাওয়ারা দেখিলেন, তাঁহার দেহে হজরত

আবুবকর (রঃ) প্রদত্ত জামা টুপী সত্যিকার ভাবে রহিয়াছে। এই হইতে পীর এবনো হাওয়ারার আধ্যাত্মিক জীবনে শুভ প্রভাত দেখা দিল।

পীর এবনো হাওয়ারা সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ওলী ছিলেন। তাঁহার বহুবিধ কারামত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। একবার এক স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া পীর এবনো হাওয়ারাকে কহিল—"হুজুর, আমার একমাত্র পুত্র 'দজ্‌লা' নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে। আপনি আমার বুকের মাণিককে নদীগর্ভ হইতে জীবন্ত উদ্ধার করিয়া দিবেন, এই আশায় আপনার নিকট ছুটিয়াছি,আমি জানি একার্য্যে আপনারই ক্ষমতা রহিয়াছে। আমার আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া যদি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, এবং ইহার ফলে যদি আমি আমার একমাত্র প্রাণের ধন হারাই, তাহা হইলে কেয়ামতের দিবসে আমার সেই নিমজ্জিত পুত্রকে লইয়া আমাদের নবী হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) এবং খলিফা হজরত আবুবকরের কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব। পুত্রহারা জননীর এই করুণ ফরিয়াদে পীর এবনো হাওয়ারার প্রাণ স্পর্শ করিল, তিনি তখনই ছুটিলেন, সেই দজ্‌লা কূলে। পীর এবনো হাওয়ারা তথায় পৌঁছিতেই ছেলেটী নদীর উপর ভাসিয়া উঠিল। তিমি সাঁতার কাটিয়া ছেলেটীকে কূলে আনিলেন, এবং তাহার মাতার হাতে দিয়া কহিলেন—"তোমার হারাণো মাণিক লইয়া বাড়ী যাও।" ছেলেটী মাতার সহিত হাসিতে খেলিতে গৃহে চলিয়া গেল, যেন তাহার কিছুই হয় নাই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বড় পীর সাহেবের কতিপয় দিগ্বিজয়ী সহচরগণের পরিচয়

গাওসল আজম্ হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বাগ্দাদে উপস্থিত হইয়া প্রথম অবস্থায় এরাকের বহু সাধু দরবেশ, ওলী আল্লাহের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইঁহাদের কাহারও নিকট হইতে পরোক্ষ কাহারও নিকট হইতে প্রত্যক্ষ শিক্ষা এবং আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন। আর কেহ কেহ তাঁহারই অনাবিল শিক্ষা, আদর্শ এবং সাহচর্য্যগুণে এক একজন সিদ্ধ কামেলরূপে সাধু জীবন লাভ করিয়া অখণ্ড মানব সমাজের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ইঁহাদের বিচিত্র জীবন কাহিনী পড়িলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। হজরত বড় পীর সাহেবের মধ্যে একেত খোদা প্রদত্ত গুণরাজি ষোল আনা ভাবে বিদ্যমান ছিল, তাহার উপর এই কতিপয় সাধু মহাপুরুষের সংসর্গ তাঁহাকে অত্যধিক উপকৃত করিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

শেখ আবুবকর এবনো হাওয়ারা

ইনি এরাকবাসী একজন অসাধারণ 'কারামত' সম্পন্ন ওলী ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি পরপর ৪০ বুধবারে আমার কবর্ জেয়ারাত করিবে, সে শেষ তারিখে খোদার মার্জ্জনা লাভের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার আরও একটী উক্তিতে আছে—"যে কেহ একবার আমার কবর-এর মাটী গায়ে মাখিয়াছে, তাহার দেহ আগুনে জ্বলিবে না।" এই কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য লোকে তাঁহার কবরের উপর মাছ রাখিয়া দিয়া পরে উহা রন্ধন করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মাছ আদৌ সিদ্ধ হয় নাই।

পীর শেখ আবুবকর এবনো হাওয়ারার প্রাথমিক জীবন অতি অদ্ভুত, তিনি এক সময়ে এক দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতদলের সর্দ্দার ছিলেন। এরাকের মরু ভূমিতে তাহাদের আড্ডা ছিল। পথচারীদের ধনপ্রাণ লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার বাহিনী সেই অঞ্চলে এক মহাত্রাসের সৃষ্টি করে।

লীলাময়ের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে। একদিন এক স্বামী-স্ত্রী ঐ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছিল। এমন সময়ে স্ত্রী লোকটী তাহার স্বামীকে কহিল—"স্বামিন্! আমাদের আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। সম্মুখে এবনো হাওয়ারার বাহিনী আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে।" দুর্দ্ধর্ষ এবনো হাওয়ারার নাম তখন ঘরে ঘরে। ইহাকে ভয় না করে এমন প্রাণী তখন ছিল না। এবনো হাওয়ারা নিকটেই ছিলেন, স্ত্রীলোকটীর কথাগুলি

শেখ মোহাম্মদ শাম্বকী বর্ণনা করিয়াছেন—একদিন আমি পীর এবনো হাওয়ারার নিকট যাইয়া দেখি, তাঁহার সম্মুখে একটী বিরাট আকার ব্যাঘ্র বসিয়া আছে, আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করিলাম, ব্যাঘ্রটী যেন পীর সাহেবের সহিত কিছু বলিতেছে, এবং তিনিও তাহার উত্তর দিতেছেন। অতঃপর ব্যাঘ্রটী ধীরে ধীরে চলিয়া গিয়া দূর বনে প্রবেশ করিল, তখন আমি পীর সাহেবকে কহিলাম—হুজুর ! ব্যাঘ্রের সহিত আপনার কি কথা বিনিময় হইল ? তিনি আমাকে কহিলেন, ব্যাঘ্রটী বলিয়া গেল গত তিন দিন হইতে সে সম্পূর্ণ অনাহারে কাল কাটাইতেছে। ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সে খোদার নিকট ফরিয়াদ করিলে তাহাকে বলা হইয়াছে, হুমাইয়া নামক পল্লীতে আজ তাহার খাদ্যের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তবে একার্য্যে তাহাকে কিছু কষ্টভোগ করিতে হইবে। তাই সে আমার কাছে জানিতে আসিয়াছিল—ইহাতে তাহার পরিণাম কি হইতে পারে। আমি লওহে-মাহ্‌ফুজে তাহার অদৃষ্ট ফলকের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হুমাইয়া পল্লীতে একটী ছাগ অপহরণ করা কালে লোকেরা তাহার দক্ষিণ পাঁজরে আঘাত করিবে, তজ্জন্য তাঁহাকে সাতদিন ভুগিতে হইবে।

শেখ মোহাম্মদ আরও বলেন—আমি অতঃপর হুমাইয়া পল্লীতে যাইয়া দূর হইতে এক তুমুল কলরব শুনিতে পাইলাম। তথায় যাইয়া দেখি একটী ব্যাঘ্র একটী ছাগ শিশুকে মুখে লইয়া পলাইতেছে, এবং বহু লোক তাহাকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে, জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি ব্যাঘ্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া

একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিক্ষেপ করিলে ইহা তাহার দক্ষিণ পাঁজরে বিদ্ধ হইয়া গেল, সে যন্ত্রণায় গর্জ্জন করিতে করিতে বনের দিকে পলাইল। এক সপ্তাহ পরে পুনরায় ব্যাঘ্রটী পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। দেখিলাম তাহার ক্ষতস্থান আরোগ্য হইয়াছে।

এই মহাপুরুষ 'বাতায়েহ্' স্থানে এন্তেকাল করেন। তথায় তাঁহার মাজার রহিয়াছে।

শেখ আদি বিন্ মোসাফির

শেখ আদি বিন মোসাফিরের কথা এই পুস্তকের বহুস্থানে উল্লেখ রহিয়াছে। ইনি হজরত বড় পীর সাহেবের সমসাময়িক হইলেও বয়সের দিক দিয়া খুবই প্রবীণ ছিলেন। বড় পীর সাহেব ইঁহাকে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। হুজুর ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—যদি কঠোর সাধনা, এবাদাত রেয়াজাত দ্বারা নবুওয়াত লাভ সম্ভব হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শেখ আদি বিন্ মোসাফির নবী হইতেন।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথমে শেখ আদি বিন মোসাফির যেরূপ কঠোর সাধনা, প্রাণান্ত সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। এইরূপ অসাধ্য-সাধন মানুষের পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর।

শেখ আদি বিন মোসাফির বাল্যকাল হইতেই ভাবুক

প্রকৃতির ছিলেন। সংসারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ আদৌ ছিল না। তিনি অধিকাংশ সময়ে বনে জঙ্গলে, গিরিপর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া খোদার এবাদতে লিপ্ত হইতেন, এই সময়ে বনের পাখী, হিংস্র জীব-জানোয়ারই ছিল তাঁহার একমাত্র সাথী, নির্জ্জনতার মাঝে ইহারাই দলে দলে আসিয়া তাঁহার সেবা করিত।

শেখ আদি বিন্ মোসাফির একজন কারামত সম্পন্ন ওলী ছিলেন। এই সম্পর্কে মাত্র কয়েকটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

আবু ইসরাইল এয়াকুব্ নামক এক সাধু পুরুষ এক উন্মুক্ত পর্ব্বত শীর্ষে দীর্ঘ দিন বৎসর দাঁড়াইয়া খোদার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এই অবস্থা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটী আবরণ পড়িয়া যায়। একদিন হঠাৎ চিতা বাঘ আসিয়া তাঁহার দেহ চাটিলে ঐ আবরণ দূরীভূত হয় এবং তিনি চেতনা লাভ করেন। অতঃপর ব্যাঘ্রটী তাঁহার দেহে প্রস্রাব করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে আবু ইসরাইলের মনে অনুতাপ জাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"এই সময় যদি কোন ওলী-আল্লাহর সাক্ষাৎ পাইতাম, তাহা হইলে বেশ হইত।" সহসা শেখ আদি বিন মোসাফির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইস্লামিক শিষ্টাচার স্বরূপ শেখ আদি তাঁহাকে সালাম করিলেন না। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে ভীষণ ক্ষুন্ন হইলেন। শেখ আদি আবু ইসরাইলের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—ব্যাঘ্র যাহার গায়ে প্রস্রাব করিয়া

দেয়, আমি তাহাকে সালাম করিতে ঘৃণা বোধ করি।” আবু ইসরাইল, শেখ আদির নিকট তাঁহার জীবনের আদ্যান্ত ইতিহাস এবং বর্ত্তমানের শোচনীয় অবস্থা বিবৃত করিলে শেখ আদি তথায় এক প্রস্তর খণ্ডের উপর পদাঘাত করিলেন। অমনি তথায় এক সুশীতল জলধারা উৎসরিত হইল। আর এক খণ্ড প্রস্তরের উপর ঐ ভাবে পদাঘাত করিলে তথায় দেখিতে দেখিতে একটী ডালিম্ব বৃক্ষ গজাইল। তখন শেখ আদি বৃক্ষটীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—হে তরু! আমি আদি বিন্ মোসাফির। খোদার নামে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। তুমি আমার এই বন্ধুটীকে একদিন সুমিষ্ট আনার এবং একদিন খাটা আনার প্রত্যহ দিবে। অতঃপর তিনি আবু ইসরাইলকে বলিয়া দিলেন—এই ঝর্ণার পানি এবং ঐ বৃক্ষের ফল তোমার আহার্য্য, আমাকে যদি কোন সময় তোমার প্রয়োজন পড়ে, স্মরণ করা মাত্রই আমি হাজির হইব।

শেখ ওমর বর্ণনা করিয়াছেন—একদিন আমি পীর শেখ আদি বিন মোসাফিরের নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময়ে বহুলোক দূরবর্ত্তী এক স্থান হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসিল। ঐ দলের মধ্যে খতিব্ হোসেন নামক এক ব্যক্তি ছিল। সেই দলের নেতা। পীর সাহেব তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—হে খতিব্! তোমার দলের লোকজনকে লইয়া আমার সঙ্গে আইস। উদ্যানের ঐ প্রাচীরটী মেরামত করিতে হইবে। খতিব্ হোসেন পীর সাহেবের সহিত সদলে চলিলেন। আমিও সে সঙ্গে চলিলাম। হুজুর পাহাড়ের

উপর হইতে প্রস্তর খণ্ড নীচে নিক্ষেপ করিতে ছিলেন, আমরা ঐ প্রস্তর খণ্ডগুলি বহিয়া লইয়া গিয়া প্রাচীরের ভগ্নস্থান সংস্কার করিতেছিলাম। হঠাৎ পর্ব্বত গাত্র হইতে এক খানি প্রস্তর এক ব্যক্তির উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটী মারা গেল। পীর সাহেব তখন নীচে নামিয়া আসিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক খোদার নিকট দোওয়া করিলেন। অমনি সে সুস্থ ও অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান হইল, এবং পুনরায় পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়া গেল।

শেখ আদি বিন মোসাফিসের জন্ম এবং বাল্য জীবন অতি চমকপ্রদ। কথিত আছে, ইঁহার পিতা শেখ মোসাফির এব্নে ইস্মাইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া হেজাজের্ অন্তর্গত 'গাবা' নামক এক জনমানবহীন স্থানে অবস্থান করিতেন। চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তথায় নির্জ্জন-জীবন অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর এক দিন তিনি স্বপ্নে দেখিতেছেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন—হে মোসাফির, তুমি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন কর। তোমার ঔরসে খোদা একজন কামেল ওলী সৃষ্টি করিবেন। শেখ মোসাফির গৃহে ফিরিয়া তাঁহার স্ত্রীকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহিলে তিনি বলিলেন—তুমি এই শহরের সর্ব্বোর্চ্চ মিনারের উপর চড়িয়া এই কথা ঘোষণা কর, "আমি দীর্ঘ দিন প্রবাসে ছিলাম। আমার প্রতি অদ্য রজনীতে দাম্পত্য ধর্ম্ম পালনের আদেশ হইয়াছে, তাহাই আমি গৃহে ফিরিয়াছি। আজ রাত্রিতে যাহারা স্ত্রীগত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকের স্ত্রীর গর্ভে এক

একজন ওলী জন্ম গ্রহণ করিবে।” শেখ মোসাফির কর্ত্তৃক এই ঘোষণা প্রচারিত হইলে সেই রাত্রিতে তিনশ’ তেরজন আওলিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

শেখ আদি মাতৃগর্ভে থাকা কালে একদিন শেখ মোস্‌লেমাহ এবং শেখ আকিল তাঁহাদের গৃহের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শেখ আদির জননী তখন গৃহের সম্মুখস্থ কূপ হইতে পানি তুলিতেছিলেন। শেখ মোসলেমাহ, শেখ আকিলকে ডাকিয়া কহিলেন—দেখ কি আশ্চর্য্য! এই মহিলার বক্ষঃস্থল হইতে একটী নূরের আভা প্রস্ফুটিত হইয়া কেমন শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তাঁহারা “আস্‌সালামো আলায় কুম ইয়া আদি” দুই দুই বার বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সাত বৎসর পরে আবার শেখ মোসলেমাহ এবং শেখ আকিল, মোসাফের এবনো ইসমাইলের বাড়ীর সন্নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, বালক আদি অন্যান্য বালকদের সহিত খেলা করিতেছেন। তাঁহারা তথায় যাইয়া তাঁহাকে সালাম জানাইলে তিনি তিন বার সালামের উত্তর দিলেন। ইহাতে তাঁহারা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বালক, তুমি আমাদের সালামের উত্তর তিনবার দিলে কেন? তখন বালক শেখ আদি উত্তর করিলেন—আপনাদের কি মনে নাই? আমি মায়ের পেটে থাকা কালে আপনারা দুইবার আমাকে সালাম করিয়াছিলেন। শরিয়াতের লাগাম আমার মুখে না থাকিলে তখনই তাহার উত্তর পাইতেন। আজ সেই সালামের উত্তরটাও দিয়া দিলাম।

শেখ আদি বিন্ মোসাফির দামেশকে বাস করিতেন। তিনি দীর্ঘকাল হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর পবিত্র সংসর্গে কাল কাটাইয়াছেন। সত্যবাদিতা, সাধু-সরল জীবন এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি ছোট বড় সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কোন দিন বাজে কথা বলেন নাই। তাঁহার সামান্য এক টুক্‌রা জমি ছিল, নিজ হাতে তিনি তাহাই চাষ করিতেন। নিজ হাতে কাপড় বুনিতেন। কাহারও গৃহে তিনি কখনও মেহ্‌মান হইতেন না। বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় ইনি রোজা রাখিতেন।

৫৫৫ হিজ্‌রীতে ৯০ বৎসর বয়সে এই সাধু পুরুষ এন্তেকাল করেন।

পীর আলী বিন হিতি

পীর আলি বিন হিতি এরাকের একজন কোতব্ শ্রেণীর ওলী ছিলেন। ইনি অধিকাংশ সময়ে গওসল আজম হজরত বড় পীর সাহেবের খেদমতে কাল কাটাইতেন। ওলী শ্রেণীর মধ্যে ইনি এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। হজরত বড় পীর সাহেব ইঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ইনিও বড় পীর সাহেবকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন।

পীর আলি বিন হিতি যতবার হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট আসিতেন, ততবার দজ্‌লা নদী হইতে নিজেও গোসল

করিয়া আসিতেন এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকেও গোসল করাইয়া লইতেন। তিনি বলিতেন, ওলী-সম্রাটের দরবারে যাইতে হইলে এই ভাবে ভিতর ও বাহির পরিচ্ছন্ন অবস্থায় যাওয়া নিহায়েত্ কর্ত্তব্য। অতঃপর পীর আলী বিন হিতি হজরত বড় পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে হুজুর দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিতেন এবং 'মোয়ানেকা' করিবার পর দক্ষিণ বাহুর কাছে বসাইতেন। এই সময়ে কি এক অজ্ঞাত ত্রাসে পীর আলি বিন হিতির সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইত! ইহা দেখিয়া হুজুর সহাস্যে কহিতেন—"আলী! তুমি ত এরাকের কোতওয়াল, সুতরাং তোমার ভয় কিসে।" তদুত্তরে পীর আলী কহিতেন—"সম্রাটের সম্মুখে কোত্ওয়াল মাছির মত নগণ্য। আপনি আমাকে অভয় দিলে আমার ভয় ও ত্রাস দূর হইবে।" হুজুর তাঁহাকে অভয় দিয়া তাঁহার ভীতি দূর করিতেন।

পীর আলী বিন হিতির নিকট একখানি অতি পবিত্রতম বস্ত্র এবং একটী টুপী ছিল। ইহা পীর আবুবকর বিন হাওয়ারাকে স্বপ্নযোগে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রঃ) পরাইয়া দিয়াছিলেন। হস্তান্তর হইতে হইতে পীর আলী বিন হিতির ইহা লাভ করিবার সৌভাগ্য হয়।

পীর আলি বিন হিতি এমন কারামত সম্পন্ন ওলী ছিলেন যে, তাঁহার দোওয়ায় খোদা কুষ্ঠরোগগ্রস্থ অন্ধ, খঞ্জ, বধিরকে ভাল করিয়া দিতেন। দীর্ঘ দিনের রোগগ্রস্থ মরণাপন্ন রোগী তাঁহার দোওয়ার কল্যাণে ভাল হইয়া যাইত। এমন কি

তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া খোদার কাছে দোওয়া চাহিলে খোদা সে দোওয়া কবুল করিতেন।

শেখ আবু মোহাম্মদ হোসন হুবানী এবং আবু হাফস ওমর এক যুক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন—একবার পীর আলী বিন হিতি 'মুলতাকী' নামক পল্লীতে তাঁহার এক আত্মীয়ের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিনের একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইলাম। পীর সাহেবের অদূরে একটী মুরগী চরিতেছিল। তিনি তাঁহার এক সঙ্গীকে ডাকিয়া কহিলেন—"ঐ মুরগীটাকে ধরিয়া জবেহ্ কর।" তদনুসারে মুরগীটা জবেহ্ করা হইলে উহার পেটের মধ্য হইতে একশত আশরাফী বাহির হইয়া পড়িল। লোকে দেখিয়া অবাক! ঐ বাড়ীর এক ব্যক্তির নিকট এক শত আশরাফী ছিল, উহা সে একস্থানে রাখিয়া দেয়। কিন্তু তাহা আর তুলিতে মনে হয় না, অতঃপর মনে হইলে উহা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন তাহার সন্দেহ হইল তাহার এক ভগ্নির উপর। জীবনের সঞ্চিত ধন ঐ একশত আশরাফী হারাইয়া লোকটী উন্মাদের মত হইয়া গেল। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, রাত্রিতে সে তাহার ভগ্নিকে খুন করিয়া মুদ্রা অপহরণের চরম প্রতিফল দিবে। কিন্তু মুরগীটা কোন্ ফাঁকে, উহা উদরস্থ করিয়াছিল তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। পীর সাহেব 'কাশ্ফ' বলে ইহা জানিতে পারিয়া একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিলেন।

একবার পীর আলী বিন হিতি এক পল্লী পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, একস্থানে দুই দলে ভীষণ সংঘর্ষ হইতেছে।

এক ব্যক্তিকে কে বা কাহারা হত্যা করিয়া পথিমধ্যে রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত হত্যাকারীকে শেনাখ্‌ত করা যাইতেছে না, সন্দেহবসে নানাজনের উপর দোষারোপ করা হইতেছে, ইহাই লইয়া তুই দলে সংঘর্ষ। পীর আলী মৃত দেহটীর শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহার কপোলদেশ স্পর্শ করতঃ কহিলেন—হে খোদার বান্দা! তোমাকে কে হত্যা করিয়াছে, শীঘ্র বল। তখনই মৃত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া তাহার প্রকৃত হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিল। অতঃপর সে পূর্ব্বের ন্যায় মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল।

শেখ আবুল হাসান জাওসাফী বর্ণনা করিয়াছেন—একদিন আমি দেখিতে পাইলাম, পীর আলী বিন হিতি নদীর কূলে এক খেজুর বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, আমি দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, বৃক্ষটী ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে এবং উহার কাঁদীগুলি পীর সাহেবের মাথার উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কাঁদীগুলি সুপক্ক খেজুরে পূর্ণ। পীর সাহেব উহা হইতে মাঝে মাঝে খেজুর চয়ন করিয়া মুখে দিতেছেন। বলা বাহুল্য তখন খেজুরের মওসুম নহে। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি হাসিয়া কহিলেন "আবুল হাসান! খেজুর খাইবে?" তিনি আমার হাতে কয়েকটা খেজুর পাড়িয়া দিলেন। আমি উহা মুখে দিয়া দেখি—সোব্‌হানাল্লাহ! কী তার মিষ্টতা, আর কী তার সৌরভ!!

জগতের বুকে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া এই মহাপুরুষ ৫৬৪ হিজরীতে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এরাকের অন্তর্গত 'জবিরান' নাম স্থানে তাঁহার মাজার এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, একটী পবিত্র জেয়ারাত্গাহ্ হিসাবে বহুলোক তথায় উপস্থিত হইয়া থাকেন।

শেখ আবু লায়েজ্ মগ্রেবী

ওলী আল্লাহগণের মধ্যে পীর আবু লায়েজ্ মগ্রেবীর স্থান অতি উচ্চে। কঠোর সাধনার দ্বারা ইনি একজন শ্রেষ্ঠ ওলীর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার দোওয়ায় অনাবৃষ্টি দূর হইয়াছে। আর্ত্ত-পীড়িতের ব্যথা-বেদনা খোদাতায়ালা দূর করিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম ভাগে পীর আবু লায়েজ পনর বৎসর কাল গভীর অরণ্যে কাল যাপন করেন। এই সময়ে বৃক্ষের ফলমূল লতাপাতাই ছিল তাঁহার খাদ্য। তিনি রাত্র দিবস খোদার ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক, গণ্ডার, হস্তি, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি বন্য পশু সকল এবং নানাবিধ বনের পাখী সর্ব্বদাই তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া থাকিত। মনে হইত ইনি যেন বনের রাজা। এই সব পশুপক্ষীরাই তাঁহার সিপাই-শান্ত্রী। অনেক সময় বানরদল তাঁহাকে নানাপ্রকার

ফল আনিয়া দিত। পশু-রাজ্যে শেখ আবু লায়েজ মগ্‌রেবীর দিনগুলি বেশ আনন্দের সহিত কাটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে পশুদলের ঝগড়া তাঁহাকেই বিচারক সাজিয়া মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। তাঁহার বিচার-সিদ্ধান্ত সকলেই নতশিরে মানিয়া লইত। দীর্ঘ পনর বৎসর কাল তিনি পশুরাজ্যে কাটাইয়া অশেষ কামালিয়াত হাসেল করিবার পর লোকালয়ে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পীরত্বের কথা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িলে বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল।

কোন জনপদে কিম্বা রাস্তা ঘাটে ব্যাঘ্রের উৎপাতের জন্য লোক সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে শেখ আবু লায়েজের 'কেরামত' তথায় আশ্চর্য্য ভাবে পরিদৃষ্ট হইত, তিনি সেই যমসদৃশ ব্যাঘ্রের নিকট যাওয়া মাত্রই সে ভিজা বিড়ালের মত জড়সড় হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইত। শেখ আবু লায়েজ তাহার কাণ সজোরে টানিয়া কহিতেন—"যা কুত্তা! এখান থেকে শীঘ্র চলে যা।" অমনি লেজ গুটাইয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে দূর বনে পলাইত।

শেখ মোহম্মদ আক্‌রেফী বর্ণনা করিয়াছেন—একবার কতকগুলি কাঠুরিয়া পীর আবু লায়েজের নিকট আসিয়া কহিল হুজুর! ব্যাঘ্রের উপদ্রবে আমরা জঙ্গলে কাঠ কাটিতে পারি না, আমাদের বহু লোককে ইহাদের হাতে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। আমরা গরীব লোক, কাঠ বিক্রয় করিয়াই আমাদের পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। হুজুর ইহার

একটী প্রতিবিধান করুন। কাঠুরিয়াদের করুণ অভিযোগ পীর আবু লায়েজের কোমল প্রাণ স্পর্শ করিল। তিনি জনৈক খাদেমকে ডাকিয়া কহিলেন—"তুমি এখনি জঙ্গলে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিবে—"হে ব্যাঘ্রদল! পীর আবু লায়েজ তোমাদিগকে এই দণ্ডে এই বন ছাড়িয়া যাইতে বলিয়াছেন। খবরদার আর কোন দিন এই পথে আসিও না। কিম্বা কোন মানুষের উপর হাম্‌লা করিও না।" খাদেম জঙ্গলে যাইয়া এই কথাগুলি বলিয়া আসিবার পর হইতে আর কোনদিন সেস্থানে ব্যাঘ্র দেখা যায় নাই।

শেখ আবু মাদায়েন বলিয়াছেন—একবার এরাকে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই সময় আমি একদিন পীর আবু লায়েজের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি এক জঙ্গলের ভিতর বসিয়া আছেন, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য বন্য পশুপক্ষী। দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন জঙ্গলের পশুপক্ষীদের এক বিরাট সম্মেলন বসিয়াছে—পীর আবু লায়েজ তাহার সভাপতি, আমি আরও দেখিলাম, এক একটী প্রাণী তাঁহার নিকট আসিতেছে এবং তিনি তাহাকে কি বলিয়া বিদায় দিতেছেন। অতঃপর প্রাণীদল এক এক করিয়া সবই চলিয়া গেল, আমি তখন পীর সাহেবকে একা পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম এবং প্রাণীদের এইরূপ একত্র সম্মিলনের রহস্য জানিতে চাহিলাম। পীর সাহেব কহিলেন—দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় পশু পক্ষীদেরও খাদ্যের অভাব হইয়াছে, তাই তাহারা আমার নিকট তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইতে আসিয়াছিল,

ইহাদের জীবিকা কোথায় এবং কিভাবে রহিয়াছে, খোদার অনুগ্রহে আমি তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, সেই সব সন্ধান আমি তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম।

একবার এক মুরিদ আসিয়া কহিল হুজুর, আমার মাত্র একখণ্ড ক্ষুদ্র জমিন্ রহিয়াছে। ইহার উৎপন্ন শস্যে কোন প্রকার আমার সংসার চলিয়া যাইত, কিন্তু অনাবৃষ্টির কারণে দেশময় দুর্ভিক্ষের হাহাকার জাগিয়াছে, আমার জমিন খণ্ডেও আর শস্য হইতেছে না, সুতরাং পরিবারবর্গ লইয়া অতিশয় বিপদে পড়িয়াছি। অনাহারে আমার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও পর্য্যন্ত শুকাইয়া মরিতেছে। মুরিদের এই করুণ কাহিনী শুনিয়া পীর সাহেব তাহার জমিন খণ্ডের উপর চলিয়া গেলেন, এবং কয়েকবার জমি বেড়িয়া ভ্রমণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে সেটুকু স্থান মেঘে ছাইয়া ফেলিল এবং তাহা হইতে মূসলধারে বৃষ্টিপাত হইল। উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় মুরিদের জমিতে বেশ ফসল জন্মিল, অথচ অন্য কোন জমিতে আদৌ বৃষ্টিপাত হয় নাই।

পরিণত বয়সে এই সাধু মহাপুরুষ ইহলীলা সম্বরণ করেন, তিনি কোথায় তাঁহার অন্তিম শয্যায় শুইয়া আছেন, ইতিহাস তাহার কোন সন্ধান দিতে পারে নাই।

শেখ আকিল্ মোম্বেজী (রঃ)

সিরিয়া দেশে শেখ আকিল একজন খ্যাতনামা পীর ও ওলী দিলেন। ইনি হজরত ওমর (রঃ) হইতে স্বপ্নযোগে খেরকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লোকে ইঁহাকে "মানুষ পক্ষী" বলিয়া অভিহিত করিত। কারণ ইনি সুদূর পূর্ব্ব দেশস্থ কোন এক মিনারা হইতে উড়িয়া সিরিয়ার মোম্বাজ স্থানে আগমন করেন। ইঁহার বহুবিধ কারামতের কথা "কালায়েতুল জাওয়াহের" নামক প্রসিদ্ধ আরবী গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি যেমন শূন্যে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, তেমনি পানিতেও বিচরণ করিতেন। ফোরাত নদীতে জায়নামাজ বিছাইয়া বহুবার লোকে তাঁহাকে নামাজ পড়িতে কিম্বা নদী পার হইতে দেখিয়াছে।

একদিন শেখ আকিল মোম্বেজী এক পর্ব্বতের পাদদেশে বসিয়া আছেন, ঐ সময়ে তাঁহার নিকট কতিপয় অপরিচিত সাধু পুরুষ বসিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতেছিলেন। উহাদের মধ্যে একব্যক্তি শেখ আকিলকে কহিল—"হুজুর, সত্যবাদীর প্রমাণ কি?" পীর শেখ আকিল উত্তর দিলেন—যে ব্যক্তির ইশারায় পাহাড় দুলিবে, মনে করিও সে সত্যবাদী।" আশ্চর্য্যের বিষয় পীর সাহেবের এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় ভীষণভাবে দুলিতে থাকিল। তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন কি? পীর সাহেব উত্তর দিলেন—প্রকৃত আধ্যাত্মিক যিনি তাঁহার সামান্য মাত্র

অঙ্গুলি হেলনে জলস্থল ও অন্তরীক্ষের সমস্ত প্রাণী তাঁহার নিকট হাজির হইবে। আমরা দেখিলাম, আমাদের চতুষ্পার্শ্বে আর তিল ধারণের স্থান নাই, প্রাণীদলের দ্বারা উহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, মৎস্য শীকারীদের মুখে শুনা গিয়াছে, ঠিক ঐ সময়ে সমুদ্রের সমস্ত জলচর প্রাণী ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

সিরিয়া দেশের মোস্বেজে ইনি মদ্‌ফুন হইয়াছিলেন।

পীর মুছা এব্‌নে হামান জুলি

একদিন হজরত গওসল্ আজম শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বাগ্‌দাদবাসীদিগকে কহিলেন, হে বাগ্‌দাদ-বাসিগণ! তোমাদের ভাগ্যাকাশে এক সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইয়াছে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর! সে কি, আমরা ত' এসম্পর্কে কিছুই বুঝিলাম না। হজরত পীর সাহেব কহিলেন—সেই সৌভাগ্য সূর্য্যটী হইতেছে শেখ মুছা এব্‌নে হামান্ জুলি।

শেখ মুছা এবনো হামান জুলি পীরত্বের এক গৌরবময় আসন লাভ করিয়াছিলেন, বহুলোক তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া শরিয়াত মারেফাতে পূর্ণ কামেল্ হইয়াছেন। হজরত বড় পীর সাহেব ইঁহাকে খুবই সমাদর করিতেন। একবার শেখ মুছা হজ্জ করিতে গমন করেন, তিনি যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় হজরত বড় পীর সাহেব তাঁহার

সম্বর্দ্ধনার জন্য বহু লোক পাঠাইয়া দেন, দুই দিনের দূর পথ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বাগ্‌দাদে আনয়ন করা হয়। শেখ মুছা এবনো হামান জুলি খোদার নিকট যে দোওয়া করিতেন, তাহাই কবুল হইত, তাঁহার দোওয়ার কল্যাণে কত অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে, কত গরিব-কাঙাল সম্পদ লাভ করিয়াছে, কত জটিল রোগগ্রস্থ রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে, কত হতাশ প্রাণে আশার মুঞ্জরী ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি অধিকাংশ সময়ে হজরত রসুলে করিম (সঃ)এর ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন, ইহার অনেক কারামতের কথা বিশ্বস্ত কেতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

একদিন এক স্ত্রীলোক শেখ মুছা এবনো হামান জুলির সাক্ষাত্ করিতে আসিল। তাহার কোলে তিন মাসের একটী শিশুপুত্র ছিল। শেখ মুছা দোওয়া করিতেই ছেলেটী মায়ের কোল হইতে নামিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। যে ছেলে বসিতে পারে না, তাহাকে বয়স্থ ছেলেদের মত দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিয়া উপস্থিত লোকগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাদের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল, যখন তাঁহারা দেখিল, পীর মুছার ইঙ্গিতে ছেলেটী পরিস্কার ভাষায় পড়িতেছে—"কোল্ হু আল্লাহু আহাদ" (শেষ পর্য্যন্ত)। ইহার পর হইতেই ছেলেটী হাটিতে, কথা বলিতে ও পড়িতে লাগিল।

বাগ্‌দাদের 'মারবীন্' নামক স্থানে শেখ এবনে মুছা বাস করিতেন। পরিণত বয়সে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এখনও তাঁহার মাজার বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা মুসলমানের অন্যতম

জেয়ারত গাছ। কথিত আছে—তাঁহাকে কবরে নামাইলে তিনি উঠিয়া বসেন এবং দুই রাকয়াত নামাজ পড়েন। এই সময়ে কবর খুবই প্রশস্ত হইয়া যায়।

শেখ আবু মোহাম্মদ আব্‌দুল্লাহ জাব্‌বায়ী

গওসল আজম হজরত সাইয়েদেনা শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর পবিত্র শিক্ষা এবং সংসর্গগুণে যে সব লোক অশেষ কামালিয়াত হাসেল করিয়াছিলেন, শেখ আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁহাদের অন্যতম।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এব্‌নে নোজ্জার্‌ ইতিহাসে বর্ণনা করিয়াছেন—শেখ আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এক খৃষ্টানের পুত্র, অতি শৈশবে ইনি ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। ইস্‌লাম গ্রহণের পর ইনি, কোরআন, হাদিস ও ফেকহ্‌ শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম এবং ফকিহদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অধিকংশ সময়ে হজরত বড় পীর সাহেবের খেদমতে থাকিয়া শরিয়াত, হকিকত, এবং মারেফাতে সুদক্ষ হইয়া উঠেন। অতঃপর তিনি এসপেহানে চলিয়া যান। সেখানে অনেক জগদ্বিখ্যাত বোজর্গের সাহচর্য্য এবং শিক্ষালাভের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি তথায় অবস্থিতি করেন।

শেখ আবুল আহসান বিন কাতেয়ী ইহার বাল্য জীবন এবং ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি বলিয়াছিলেন —আমি একজন খৃষ্টান পাদরীর পুত্র, 'লাবনান' পর্ব্বতের নিকট হোব্বা নামক প্রসিদ্ধ খৃষ্টান পল্লীতে আমরা বাস করিতাম। অতি শৈশবে আমার পিতৃবিয়োগ হয়, আমাদের পল্লীর চতুষ্পার্শ্বে অনেক মুসলমানের বাস ছিল। আমি তথায় যাইতাম এবং তাহাদের কোরআন পাঠ শুনিয়া আমার অন্তর ব্যাকুল ও চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইত। মুসলমানদের সংস্পর্শে যতই আসিতে লাগিলাম, ইসলামের প্রতি ততই যেন আমার আকর্ষণ বাড়িতে লাগিল, তখন আমার বয়স মাত্র ১১ বৎসর, বুদ্ধি ও জ্ঞান নিতান্ত অপরিপক্ক হইলেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা এবং বিশ্ব-জনীন ইসলামের অনাবিল মাহাত্ম্য আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম। সত্যই একদিন স্বর্গীয় মশাল আমার মনের আঁধার ঘুচাইয়া দিল, আমি ইসলামের শান্ত-শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। ৫৪০ হিজরীতে আমি বাগদাদে আগমন করি।

ইহার বহু কারামত এবং কঠোর সাধনার কথা জাহবী, এবনো রজব প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ৬০৫ হিজরীতে ইনি এস্পেহানে এন্তেকাল করেন।

শেখ আবু ওমর ওসমান

শেখ আবু ওমর ওসমান কত উন্নত শ্রেণীর ওলী ছিলেন। তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে অতি সহজেই বুঝা যাইবে। খোদা তা'লা ইহাকে এমন অলৌকিক শক্তি-সম্পদ দান করিয়াছিলেন যে, মানব-দানব, পশু-পক্ষী সবই তাঁহার বাধ্য ছিল।

শেখ আবু হাফ্স্ ওমর বিন্ বাস্দ্ রাবেয়ী বর্ণনা করিয়াছেন—শেখ আবু ওমর প্রথমতঃ এগার বৎসরকাল গভীর বন জঙ্গলে বাস করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কোনদিন কোন মানুষের সংস্পর্শে আসেন নাই। জঙ্গলের ঘাস-পাতা খাইয়াই তিনি জীবন ধারণ করিতেন। প্রত্যেক বৎসর শীত ঋতুর প্রারম্ভে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনি একটী করিয়া পশমের জামা পাইতেন। একবার হঠাৎ আকাশের দিকে তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। নীল আকাশের কোলে কেমন চাঁদের মিষ্টমধুর হাসি—তারার ঝিকিমিকি। তিনি নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া থাকিলেন ত' থাকিলেন! কত শীত গেল, বসন্তের রোমাঞ্চ জাগিল, বসন্ত গেল গ্রীষ্ম আসিল। গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষা দেখা দিল, কিন্তু শেখ আবু ওমরের আর ধ্যান ভাঙ্গে না। মাথার উপর দিয়া কত ঝড় তুফান চলিয়া গেল। সাত বৎসরের পর হঠাৎ একদিন ঐশীবাণীর ঝঙ্কারে তাঁহার ধ্যান টুটিল—"হে আবু ওমর, কতদিন আর এইভাবে সংসার ধর্ম্মকে ফাঁকী দিবে। যাও গৃহে যাও, তোমার ঔরসে

এক সাধু পুরুষের জন্ম হইবে।” ঐশীবাণী শুনিয়া বনচারী পথিক গৃহে ফিরিলেন। আত্মীয় পরিজনের মধ্যে তুমুল আনন্দ কোলাহল জাগিল। কিন্তু যাহার মন অসীম রাজ্যের সহিত সংযুক্ত, তাহাকে সংসার-পিঞ্জরে কতক্ষণ আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব। রাত্রিটী কোন গতিকে কাটাইয়া—ঐশ ইঙ্গিত পালন করিয়া প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি বনের পথ ধরিলেন। অসীম-অনন্ত রহস্য দিয়া ঘেরা বনের প্রত্যেক পত্রটী তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সুতরাং তিনি কি করিয়া গৃহে স্থির থাকিতে পারেন।

আবার তিনি পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরের রসগন্ধে ভরা মুক্ত বাতাসে তাহার প্রাণ জুড়াইল। পুনরায় অনন্ত রহস্যময় আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে ধ্যান-স্তিমিত সাধকের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। সাত বৎসরের পর তাঁহার জীবনের গতি ফিরিল। তিনি চেতনা রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার চুলদাড়ি এত অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিলে একটী বিরাট লোমস্তূপ ছাড়া আর কিছুই মনে করিবার উপায় ছিল না। বন্য পশুপক্ষিগণ তাঁহার চতুষ্পার্শে সমবেত হইয়া নীরবে এই সাধু পুরুষের ধ্যান মূর্ত্তি দেখিত।

চৌদ্দ বৎসরকাল তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার যে ফরজ কার্য্যগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতঃপর

তিনি লোকালয় ফিরিয়া আসিয়া তাহার 'কাজা' আদায় করিতে লাগিলেন।

শেখ আবুল ফাত্তাহ্ গানায়েম বর্ণনা করিয়াছেন—শেখ আহমদ রফায়ীর নিকট এক ব্যক্তি একটী দুর্ব্বল জীর্ণ-শীর্ণ বলদ সহ উপস্থিত হইয়া কহিল—"হুজুর, আমি একজন গরীব চাষী, এই বলদটীর সাহায্যে চাষ-কারকিত্ করিয়া আমি আমার দুস্থ পরিবারের মুখে অন্ন জোগাই, কিন্তু বর্ত্তমানে বলদটী চাষের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, আমার দ্বিতীয় বলদ কিনিবার শক্তি নাই, তাই সংসারের পরিণাম ভাবিয়া আমি আতঙ্কিত হইতেছি। আপনি খোদার কাছে একটু দোওয়া করুন, যেন খোদা আমার এই দুর্ব্বল কৃশ বলদটীকে পুনরায় শক্তিদান করেন।" ইহা শুনিয়া শেখ আহমদ রাফায়ী কহিলেন, "বাবা তুমি এই গরুটী লইয়া শেখ আবু ওমর ওসমানের নিকট চলিয়া যাও, এবং তাঁহার কাছে তোমার করুণ কাহিনী ব্যক্ত কর। নিশ্চয়ই সুফল পাইবে।" তদনুসারে লোকটী বলদসহ শেখ আবু ওমর ওসমানের নিকট আসিল। তিনি তখন এক নদীকূলে বসিয়া ছিলেন। লোকটিকে কিছুই বলিবার সুযোগ না দিয়া তিনি একটী ব্যাঘ্রকে আহ্বান করিলেন। সে আসিয়া গরুটিকে মারিয়া ফেলিল এবং ইহার অর্দ্ধাংশ ভক্ষণ করিল। শেষে আবু ওমর ওসমান ব্যাঘ্রটিকে তাড়াইয়া দিয়া আর একটিকে ডাকিলেন। সেও আসিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ খাইয়া ফেলিল। লোকটী কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। হঠাৎ তথায় একটী হৃষ্টপুষ্ট

বলদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শেখ আবু ওমর ওসমান লোকটিকে কহিলেন—তুমি এই বলদটী লইয়া গৃহে যাও।" কিন্তু তাহার মনে দ্বিধা জাগিল,—"কাহার গরু আমি লইয়া যাইব, শেষে কি বিভ্রাট ঘটাইব?" শেখ আবু ওমর ওসমান লোকটীর মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। এমন সময় তথায় আর একটি লোক উপস্থিত হইয়া কহিল—"হুজুর আমি আপনাকে একটি গরু নজর দিব বলিয়া রাখিয়া দিয়া ছিলাম, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে কোথায় উধাও হইয়াছে।" শেখ আবু ওমর ওসমান গরুটি দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "এই তোমার গরু, যাহাকে নজর দিয়াছ, ঠিক তাহারই কাছে সে উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমার নজর গ্রহণ করিয়া আর একজনকে উহা নজর দিলাম।"

যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি গরুটী লইয়া যখন বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইতেছিল, তখন শেখ আবু ওমর ওসমান তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—"একটু দাঁড়াও ভাই, তোমার সহিত একটী পাহ্‌রাদার দিয়া দিতেছি। বনের পথে যাইতে হইবে, হিংস্র প্রাণীর ভয় রহিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি একটী ব্যাঘ্রকে ডাকিলেন, এবং তাহাকে ইঙ্গিত করিতেই উহা লোকটীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। লোকটীর বাড়ী পর্য্যন্ত ঐ ব্যাঘ্র সঙ্গে ছিল।

শেখ আবদুল লতিফ এবনো আহমদ্ কারশী বর্ণনা করিয়াছেন—একবার সাতজন শিকারী জঙ্গলে ঢুকিয়া বেপরোয়া ভাবে পক্ষী শিকার করিতেছিল। তাহারা যে পক্ষীর দিকে গুলি নিক্ষেপ করে, সেটীই গুলির আঘাতে

জর্জ্জরিত হইয়া মৃত অবস্থায় মাটীতে পড়িয়া যায়। এইভাবে তাহারা বহু পক্ষীর জীবন নাশ করিল। কিন্তু একটিও খাইবার যোগ্য রহিল না। এই সময়ে শেখ আবু ওমর ওসমান তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন—তোমরা অনর্থক এতগুলি প্রাণীর জীবন বধ করিলে। মৃত প্রাণী ভক্ষণ হারাম। সুতরাং এগুলি দিয়া তোমরা কি করিবে ? শিকারীরা রহস্যস্থলে কহিল—"আপনি এইগুলিকে জ্যান্ত করিয়া দিন, তারপরে কি করিব, পরে বিবেচনা করা যাইবে।" শেখ আবু ওমর ওসমান ইহা শুনিয়া একটি দোওয়া পড়িতেই বন্দুকের গুলিতে বিচ্ছিন্ন দেহ পক্ষীগুলি অমনি জ্যান্ত হইয়া উড়িয়া গেল।

শেখ আবু ওমর ওসমান 'বাতায়েহ্' নামক স্থানের বাশিন্দা ছিলেন, পরিণত বয়সে তথায় তিনি এন্তেকাল করেন।

জিয়াউদ্দিন আবদুল কাহের সাহরাওয়ার্দ্দী

ইনি এরাকের তৎকালীন ওলীদের মধ্যে অন্যতম ওলী ছিলেন। বিদ্যাবত্তার দিক দিয়াও ইঁহার সুনাম সুখ্যাতি প্রচুর ছিল ; বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসায় ইনি একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক ছিলেন। ইসলামিয়া শরিয়াতের জটিল প্রশ্নের সঠিক উত্তর ইঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইত বলিয়া

দলে দলে লোক তাঁহার কাছে ফতওয়া লইতে আসিত। ইনি শরিয়ত ও হকিকত সম্পর্কে অনেকগুলি মূল্যবান কেতাব্ লিখিয়াছিলেন। দূর দূরান্তর হইতে বহু ছাত্র ইঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে আসিত। ইনি প্রায়ই অশ্বতরের উপর সওয়ার হইয়া ভ্রমণ করিতেন। ইঁহার আচার ব্যবহার এত শিষ্ট ও নম্র ছিল যে, ছোটবড় প্রত্যেকেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। ইঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র জগৎ-মান্য পীর শেখ শেহাবুদ্দিন সাহরাওয়ার্দ্দী।

শেখ জিয়াউদ্দীন তাসাওফ্ সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—তাসাওফ্ শিক্ষার প্রথম অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার কঠোরতাকে বরণ করিয়া লইতে না পারিলে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ; নাফছের সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাসাওফের দুর্গম পথে চলিতে হইবে। পদে পদে বিপদ আসিবে, তাসাওফ্ শিক্ষার্থীর এদিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। ইহাদের আহার-বিহার, ইহাদের নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না।

শেখ শেহাবুদ্দিন সাহরাওয়ার্দ্দী বলিয়াছেন—আমার শ্রদ্ধেয় চাচা কোন মুরিদের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলে সে কামেল হইয়া যাইত। তিনি তাঁহার মুরিদদিগকে নিকটে বসাইয়া প্রত্যেকেরই অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেন। কাহাকেও বলিতেন, "আজ রাত্রিতে শয়তান তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে আসিবে, কিন্তু ইহাতে ভয় করিবে না।" কাহাকেও বলিতেন—"তুমি আজ রাত্রিতে অমুক আশ্চর্য্য

আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিবে।" তাঁহার এই সব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়া যাইত।

শেখ শেহাবুদ্দীন আরও বর্ণনা করিয়াছেন—আমি একদিন আমার চাচার নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় একব্যক্তি একটী গো-বৎস লইয়া তাঁহার নিকট আসিল এবং কহিল—"হুজুর, এই গো-শাবকটী আমি আপনাকে উপহার দিতে আনিয়াছি, দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।" আমার চাচা উহা গ্রহণ করিলে লোকটী চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর গো-শাবকটী আমার চাচাজীকে নির্ব্বাক ভাষায় যেন কি বলিল, তখন চাচাজী আমাদিগকে কহিলেন, এই বাছুরের মুখে শুনিলাম, এইটী শেখ আলী বিন হিতিকে নজর দেওয়া হইয়াছিল, লোকটী ভুল করিয়াছে, আমার জন্য যেটী রাখিয়াছিল, তাহা আনে নাই। একটু পরে সেই ব্যক্তি আর একটী বাছুর লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, উহা আমার চাচাজীকে দিয়া প্রথমটী শেখ আলি বিন্ হিতিকে দিতে লইয়া গেল।

শেখ মোহাম্মদ আবতুল্লাহ বিন মসউদ রুমী বর্ণনা করিয়াছেন—একদিন আমি পীর জিয়াউদ্দিন আবতুল কাহের সাহরাওয়ার্দ্দীর সহিত বাগ্দাদের এক বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, পার্শ্বের এক কশাইয়ের দোকানে একটী চর্ম্মমুক্ত ছাগল লট্কানো ছিল। হুজুর ইহার সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কশাইকে কহিলেন—দেখ, তোমার এই ছাগলটী বলিতেছে, সে মরা। কশাই এই কথা শুনিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, কিছুক্ষণ পরে তাহার চেতন হইলে—সে হুজুরকে কহিল,

আমি অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন, বাস্তবিকই মরা ছাগল আমি ছিলিয়া বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। হুজুর তাহাকে ভবিষ্যতে আর এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া তওবা করাইলেন। তখনই ছাগলটী ফেলিয়া দেওয়া হইল। আর এক সময় আমি হুজুরের সহিত শহরের এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম, আমরা দেখিতে পাইলাম, একব্যক্তি কিছু ফলসহ আমাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। হুজুর তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—তোমার এই ফলগুলি আমার নিকট বিক্রয় কর। লোকটী কহিল—কেন, বাজারে ত' যথেষ্ট ফল রহিয়াছে। হুজুর কহিলেন—আছে তাহা আমিও জানি, কিন্তু তোমার এই ফলগুলি কেন কিনিতে চাহিতেছি, তাহার রহস্য শুনিবে? ফলগুলি বলিতেছে—"আমাদিগকে এই শারাব্‌খোরের হাত হইতে রক্ষা করুন, এই ব্যক্তি ভীষণ মদ্যপায়ী, আমাদিগকে ভক্ষণ করিয়াই সে পুনরায় মদ খাইবে, আমরা তাহার নাপাক্ উদরে থাকিতে পারিব না।" এই কথা শুনিয়া লোকটী বজ্রাহতের মত মাটীতে পড়িয়া গেল, কিছুক্ষণ পর তাহার চেতনা লাভ হইলে কহিল—আমি মদ পান করিয়া থাকি, ইহা কেহই জানে না, আজ ঐশ-শক্তিতে আপনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণে আমি তওবা করিতেছি, জীবনে আর কোনদিন ঐ জিনিষ স্পর্শ করিব না।

৫৬৩ হিজরীতে এই সাধুপুরুষ বাগ্‌দাদেই এন্তেকাল করেন।

শেখ আবুল হাসান্ জওসী

শেখ আবুল্ আহ্সান সওসী, পীর বাকা বিন্ বতুর খাদেম ছিলেন। ইহারই শিক্ষা, পবিত্র সংসর্গ শেখ আবুল্ আহ্সানকে সাধু মহাপুরুষে পরিণত করে।

শেখ ওমর বাজ্জাজ বর্ণনা করিয়াছেন—একবার পীর আলি বিন্ হিতির শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। ইহা শুনিয়া মাহ্বুবে সোভহানী, কুতবে রব্বানী শেখ আবছুল কাদের জিলানী (রঃ) তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তাঁহার সহিত পীর বাকা বিন্ বতু, পীর আবু সায়েদ্ কেয়াদী এবং পীর আহমদ জাওসিও ছিলেন। এই সমস্ত সম্মানিত অতিথির সমাদর করিতে পীর আলি বিন হিতি অসুস্থ শরীরেও খুব ব্যস্তসমস্ত ছিলেন। ইহাদের আহারের জন্য তিনি শেখ আহ্সানকে দস্তারখান বিছাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। শেখ আবু আহ্সান রুটী হাতে দাঁড়াইয়া মুশ্কিলে পড়িলেন। এই তিনজন বোজর্গের মধ্যে কাহার সাম্নে অগ্রে রুটী রাখিবেন, এই ছিল তাঁহার চিন্তা। তখন সহসা শেখ আবু আহ্সানের মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। তিনি রুটীগুলি মধ্যস্থলে এমনভাবে নিক্ষেপ করিলেন, যাহা এক সঙ্গে প্রত্যেকেরই সম্মুখে যাইয়া পড়িল। শেখ আবু আহ্সানের এই কার্য্য উপস্থিত সকলেরই পছন্দ হইল। হজরত বড় পীর সাহেব হাসিয়া কহিলেন—হে আলি বিন্ হিতি! তোমার খাদেমটী বেশ বুদ্ধিমান! তখন পীর আলি বিন্ হিতি কহিলেন,

হুজুর! আমরা উভয়েই আপনার গোলাম। আবু আহ্সান এখন হইতে আপনারই খেদমত করিবে। সে আপনার সঙ্গেই থাকিবে। ইহা শুনিয়া শেখ আবু আহ্সানের চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্লাবিত হইয়া উঠিল। তখন হজরত বড় পীর সাহেব কহিলেন আবু আহ্সান যে নহরের পানি এ যাবত পান করিতেছে, উহাই পান করিতে থাকুক, ইহাতেই তাহার ফায়দা রহিয়াছে।

শেখ মসউদ্ হারেসী বর্ণনা করিয়াছেন—আমি এবং পীর আবদুর রহমান একদিন শেখ আবু আহ্সানের নিকট যাইতে-ছিলাম। তখন একজন শ্রেষ্ঠ ওলীরূপে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, আমরা যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক স্থানে দেখিতে পাইলাম, একটী ভীষণ কুৎসিত লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় একস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। সে আমাদিগকে দেখিয়া করুণ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং কহিল—আপনারা পীর আবু আহ্সানের নিকট যাইতেছেন, দয়া করিয়া আমার জন্য তাঁহার নিকট একটু সুপারিশ করিবেন, যেন তিনি আমাকে এই দুরবস্থা হইতে মুক্তি প্রদান করেন। আমরা শেখ আবু আহ্সানের নিকট উপস্থিত হইয়া পথিপার্শ্বস্থ লোকটীর শোচনীয় দুর্গতির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন—এটী ভীষণ খবিস্ শয়তান, ফকিহ্দের মনে কুপ্রেরণা জাগাইয়া তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত করাই ছিল ইহার কাজ। আমি বহুবার ইহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি, তবুও সে তাহার অপকর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। সে বহুবার তাহার এক্রার ভঙ্গ করিয়াছে। তাই আমি উহাকে এইভাবে বন্দী করিয়া

রাখিয়াছি, আপনারা এই পামর শয়তানের জন্য সুপারিশ করিবেন না।

শেখ আবু আহ্সান তৎকালীন একজন গণ্যমান্য ওলী ছিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বহু লোক পীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এরাকে ইনি এন্তেকাল করেন। তাঁহার মাজার এখনও তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা একটী বিশিষ্ট জেয়ারাত্গাহ।

* * * *

'স্পর্শমণি'র ছোঁয়া লাগিলে যেমন লৌহও সোনা হইয়া ফুটিয়া উঠে, গওসল্ আজম্ সইয়েদেনা হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)এর পবিত্র সংসর্গগুণে বহুলোক অশেষ কামালিয়াত্ হাসেল করিয়া দেশমান্য পীর, দরবেশ, ও ওলী-আল্লাহে পরিণত হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাঁহাদের সকলের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। মাত্র কয়েক জনের যৎসামান্য আলোচনা করিয়া আমরা এবিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

উপসংহার

তাসাওফ্ বা আধ্যাত্মিকতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে কতিপয় বিশ্ববিশ্রুত ওলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। ইঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে এমন সব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা কেয়ামত্ পর্য্যন্ত লোকের হৃদয়পট হইতে মুছিবে না। ইঁহাদের অনাবিল শিক্ষা, আদর্শ জীবন চিরদিন মর্ত্ত্যমানবের অনুকরনীয়। ধরনীর ধূলার দ্বারের মানব আমরা—তাঁহাদের অমর স্মৃতির কূলে দাঁড়াইয়া সহস্র সালাম জানাই। ইঁহারা এক একজন অতি সাধারণ মানুষ সত্ত্বেও কিসের কল্যানে মানব সমাজের বরেণ্য এবং ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন, এইখানে সে সম্বন্ধে তুই একটী কথা আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না। প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে কোন না কোন ওলী-আল্লাহ ছিলেন, এখনও আছেন। ইঁহারা বাদশাহ-নবাব্ হইতে শুরু করিয়া পথের দীন-হীন কাঙাল পর্য্যন্ত সমভাবে সর্ব্বশ্রেণী লোকের সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের দরবারে উপস্থিত হইলে অতি উদ্ধতেরও মস্তক আপনিই অবনত হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষের ও ইঁহাদের মধ্যে ব্যবধান আকাশ পাতাল। মারেফাতের স্বর্গীয় নূর ইঁহাদের দেহের মণি-কোঠায় প্রজ্বলিত। তাহাই বিশ্বের যাবতীয় চরাচর ইঁহাদের কাছে অবনত মস্তক।

এক শ্রেণীর লোক বলিয়া থাকেন, তাসাওফ্ বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, তা ছাড়া ইহা মানুষের কর্ম্ম-জীবনে ভীষণ ক্ষতিকর। ইহার দ্বারা মানুষ গৃহ ও সংসার ধর্ম্মকে অতি নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়া থাকে। তাসাওফ্ যে সংসার-বিরোধী মোটেই নহে, বরং ইহা মানুষকে প্রকৃত গৃহী, প্রকৃত সংসারী, প্রকৃত কর্ম্মীতে পরিণত করে, এমন কি ইহা মানুষকে জীবনের পরিপূর্ণতা আনিয়া দেয় ইহা তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর। ধরুন, একটী অবুঝ ক্ষুদ্র শিশুর হস্তে একখানি তিক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা রহিয়াছে। শিশু জানেনা ছুরিকাখানির অনিষ্ট-কারিতা কি? হয়তো সে ইহাকে খাদ্যবিশেষ মনে করিয়া মুখে পুরিতে পারে। ক্ষুদ্র শিশুর নিকট হইতে কোন জিনিষ কাড়িয়া লইতে গেলে সে উহা সহজে দিতে চাহিবে না। এই অবস্থায় ছুরিকাখানি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে যাওয়াও ভীষণ বিপজ্জনক। কাড়াকাড়ি করিতে গেলে হয়তো ইহার দ্বারা শিশু নিজেরই দেহে আঘাত করিবে। এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় ছুরিকাখানি তাহার হাত হইতে লইবার সহজ উপায় কি? শিশু ফল বা মিঠাই দেখিলে দুনিয়ার সব কিছু ভুলিয়া যায়। অতি অবুঝ শিশুরাও খাবার জিনিষ দেখিয়া হাত বাড়াইবে শিশু-মনস্তত্ত্বের ইহা একটী সাধারণ নীতি। এই অবস্থায় যদি কোন খাদ্য দ্রব্য উক্ত ছুরিকাধারী শিশুর সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে, সে নিশ্চয়ই ছুরিকা ফেলিয়া উহা লইতে ছুটিবে।

মানুষ যত বুদ্ধিমানই হউক, মায়াবিনী দুনিয়ার নিকট সে

ক্ষুদ্র শিশু। তাই দুনিয়ার রঙিন প্রলোভন এবং দুর্ব্বার কুহকজালে পড়িয়া আমরা পদে পদে প্রতি মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইতেছি। সামান্য দুঃখে আমরা ব্যথিত হই, শোকে এলাইয়া পড়ি। তা-ছাড়া দুনিয়ার কুহক ফাঁদে আমরা আবদ্ধ থাকি বলিয়া নাফ্‌ছ বা কুপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে নাকে দড়ি দিয়া ভালুক নাচাইতেছে। এই অবস্থায় তাসাওফ্‌ রূপ মিষ্টফল কিম্বা সুরসালো মিঠাই যদি কেহ আমাদের সম্মুখে ধরেন, তাহা হইলে আমরা অনিত্য দুনিয়ার মায়া-মোহ কাটাইয়া খোদার দিকে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হইব।

শ্রদ্ধেয় জনাব আল্‌হাজ্‌ খান্‌ বাহাদুর মওঃ আহছানউল্লাহ এম, এ সাহেব তাঁহার "তরীকত শিক্ষা" গ্রন্থের এক স্থানে তাসাওফের সাধারণ সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"যে জ্ঞান দ্বারা মানব পরমাত্মার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহাকে তাসাওফ্‌ বলে। মানবাত্মা যতই পার্থিব মায়া হইতে আপনাকে অনাকৃষ্ট করিতে পারে, ততই উহা পরমাত্মার অনুভূতি লাভে সক্ষম হয়। যতই নাফছের উপর আত্মা বা রুহের প্রভুত্ব বা অধিকার জন্মে, ততই মানবের পরমাত্মা জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিরূপে নাফছের উপর মানব কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, তাসাওফ্‌ তাহা শিক্ষা দেয়।" কিন্তু এই তাসাওফ্‌ শিক্ষা করিয়া পরমাত্মার জ্ঞানলাভ কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন এবং ওলী-আল্লাহগণের সাহচর্য্য, শিক্ষা ও আদর্শ ব্যতীত সম্ভব নহে। যেমন এক প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপে সহজেই আলো সঞ্চারিত করা যায়, সেইরূপ মারেফাতের নূরে যাঁহার

অন্তর-রাজ্য আলোকিত, অন্য অন্তরও ইহা হইতে আলো পাইতে পারে। সেইজন্য পীরের আবশ্যকতা—মুর্শিদের প্রয়োজন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তাসাওফ্ হিন্দুদের ব্রহ্মচর্য্য এবং সন্ন্যাস ধর্ম্মের এক ইস্‌লামী সংস্করণ। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের সন্ন্যাসব্রত বা ব্রহ্মচর্য্য এবং ইসলামের তাসাওফ্ যে এক জিনিষ নহে, তাহা ইহারা একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতেন। ইস্‌লাম সন্ন্যাসব্রত বা বৈরাগ্যকে আদৌ সমর্থন করে নাই। সুতরাং ইসলামের তাসাওফ্ মানুষকে সংসার হইতে বনের দিকে—পাহাড় পর্ব্বতের দিকে খেদাইয়া না দিয়া প্রকৃত সংসারী হইতে শিক্ষা দেয়। ইসলামের নবী, খলিফায়ে রাশেদিন প্রভৃতি তাসাওফ্ জগতে সম্রাট ছিলেন। অথচ সংসারী হিসাবে ইহাদের তুলনাই হয় না। তাঁহারা দেশ শাসন করিয়াছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়াছেন, সংসারের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে কাল কাটাইয়াছেন। হজরত বড় পীর সাহেবের জীবনেও আমরা ইহার পূর্ণ মাহাত্ম্য দেখিতে পাই। ছোট খাটো একটী পল্লীর মত ছিল তাঁহার সংসার, অথচ তিনি জগতের ওলী-আল্লাহগণের অগ্রণী—সেরে-তাজ।

মারেফাতের দিশারী যাঁহারা—যুগে যুগে মানুষকে যাঁহারা খোদার পথে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের হাজার তস্‌লীম।

গওসল আজম হজরত বড় পীর সাহেবের মোনাজাত

হজরত বড় পীর সাহেবের পুত্র হজরত শেখ আব্দুর রাজ্জাক্ বলিয়াছেন—আমার পিতা নিম্নলিখিত দোওয়া গুলির দ্বারা মোনাজাত করিতেন—

(১) আল্লাহোম্মা এন্না নাউজো বে-অছলেকা মিন সাদ্দেকা অ বে-কোর-বেকা মিন্ তার্‌দেকা অ বে-কুবুলেকা মিন রাদ্দেকা অজ্‌য়াল্‌না মিন আহ্‌লে তায়াতেকা অ-ওদ্দেকা অ আহিল্লানা লে-শুক্‌রেকা অ হাম্‌দেকা, ইয়া-আর হামার রাহেমিন।

অর্থ—হে আল্লাহ! তোমার সহিত মিলিত হইবার পর বিচ্ছিন্ন হইতে, তোমার নৈকট্য লাভের পর বিতাড়িত হইতে, তোমার ভালবাসা লাভ করিবার পর বিরাগ ভাজন হইতে তোমার নিকট পানাহ্ প্রার্থনা করিতেছি। হে করুনাময়, তোমার বন্দেগী তোমার এবাদাতকারীদের মধ্যে আমাকে স্থান দিও। আমাকে তোমার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সৌভাগ্য দান করিও।

(২) আল্লাহুম্মা নাছয়ালোকা ইমানান্ এয়াছলাহো লিল্ আরদে আলায়কা অ একানান্ নাকেফো বিহি ফিল্ কেয়ামাতে বায়না এদায়কা অ এছ্‌মাতান্ তোন্‌কেজোনা বেহা মিন্ অরা তাতাজ্জুনুবে অ রাহ্‌মাতান্ তোতাহ্‌হেরোনা বেহা মিন দানাছিল উ-ইউবে অ এল্‌মান নাফ্‌কোতা বেহি আওয়ামেরাকা অ নাওয়াহিকা অ ফাহমান না'লামো বেহি কায়ফা মোনাজিকা অজয়ালনা কিদ্দুন্‌ইয়া আল্ আখেরাতে

মিন্ আহ্লে বেলায়াতেকা অ আমলাও কুলুবানা বেনূরে মারেফাতেকা অ আক্হাল অউয়ুনা অকুলেনা বেআছমাদে হেদায়াতেকা অ আহরেছো আক্দামা আফ্ কারেনা মিন মাজালেকে মাওয়াতেয়াশ্ শোবহাতে অ আমনাও তোইউবা স্নফুছেনা মিলান অকু'য়ে ফিশ্ শাব্বাকে মোবেকাতিশ শাহ্ ওয়াতে অ আয়েন্না কি একামাতিছছালাতে আলা তারকিশ শাহ্ ওয়াতে অ অম্হো ছুতুরা ছাইয়েআতেনা মিন জাওয়ায়েদে আমালেনা বে-আয়েদিল হাছানাতে কুন্লানা হায়ছো এয়ান-কাতেওর্ রাজাও মিন্না এজা আ'রাদা আহলিল্ জুদে বেওজুহেহিম্ আন্না হিনা তাহছেলো কি জুল্মিল লাহুদে আহায়েনো আফ্ য়ালেনা এলা এয়াওমিল মাশহুদে অয়াজোর্ আব্ দাকাজ জাইফে আলা মা আল্লাফা অ আ'ছেমহু মিনাজজালালে অ অক্কেফহু অলহাদেরিনা লেছালেহিল্ কাওলে অল আমালে অ আজ্ রে আলা লেছানেহি মা এয়ানতেফও বেহিছ ছামেও অ তাজ্ রাফো লাহুল মাদামেও অইউদাইএনোল কাল্বোল্ খাশেও অগ্ ফেবুলাহু অলিল্ হাজেরিনা অলে জামিঈল মোছলেমিন।

অর্থ—হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে এমন শ্রেণীর ইমান দান কর, যাহা তোমার কাছে পেশ্ করিবার যোগ্য। আমাকে এমন বিশ্বাস দান কর যাহার বলে আমি কেয়ামতের দিন তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি। আমাকে এমন গৌরব নাছিব কর, যাহা আমাকে গোনাহর পাকচক্র হইতে বাঁচাইতে পারে। আমার উপর তোমার বিন্দু পরিমান রহম্ত

নাজেল কর, যেন আমি চিরদিন আয়েবের মলিনতা হইতে পবিত্র থাকিতে পারি। আমাকে ঐ এলম্ শিক্ষা দাও যাহার দ্বারা আমি তোমাকে চিনিতে পারি, আমাকে ঐ জ্ঞান দান কর, যাহা দিয়া তোমার দরগাহে দোওয়া মাগিতে পারি, হে আল্লাহ! তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে আমাকে "আহলে-আল্লাহ্"গণের অন্তর্ভুক্ত কর। আমার অন্তরে তোমার মারেফাতের আলো জ্বালিয়া দাও, আমার জ্ঞানের চক্ষে হেদায়েতের ছুরমা লাগাইয়া দাও, আমার পদদ্বয় অন্যায় পথে ধাবিত হওয়া হইতে এবং আমার মন-পাখীকে কুপ্রবৃত্তির বাসায় গমন হইতে বাধা দান কর। আমাকে রিপুর দাসত্ব হইতে বাঁচাইয়া নামাজ ও রোজার দিকে লিপ্ত করাও, আমার আমলনামার গোনাহগুলি নেকিতে পরিবর্ত্তন করিয়া দাও, হে আল্লাহ! কেয়ামতের দিনে তুমিই আমার একমাত্র মদদ্গার এবং একমাত্র সহায় হইও, তোমার এই দীন হীন বান্দার কার্য্যের প্রতিফল দিও, তাহাকে এবং যাবতীয় মুছলমানদিগকে ভাল কথা বলিবার ভালকাজ করিবার তওফিক দিও। তাহার মুখ হইতে এমন কথা প্রকাশ করাও যাহা শ্রোতৃগণের উপকারে আসে যাহা শুনিলে চোখে অশ্রু দেখা দেয়, কঠিন প্রাণও গলিয়া যায়। হে খোদা! উপস্থিত এবং যাবতীয় মুছলমানের গোনাহ্ মাফ্ কর। আমীন।

নবী ও ওলীদের নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মনীতি

হজরত আদম সফিউল্লাহ হইতে আরম্ভ করিয়া খাতেমুন্নাবিঈন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লোল্লাহো আলায় অসাল্লাম্ পর্য্যন্ত নবুয়াতের যুগ। এই যুগে বহু নবী আবির্ভূত হইয়া বিভ্রান্ত মানবদিগকে সত্য পথে আনিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) এর পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের জীবনী পাঠ করিলে জানা যায়, ইহারা কেহই প্রচার জীবনে পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া—নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য করিয়া মুষ্টিমেয় লোককে সৎপথে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন কোন নবীর যুগে মানুষ ধর্ম্মদ্রোহিতার চরম প্রতিশোধ পাইয়াছে। আদ ও সামুদ বংশ তাহাদের নবীকে অমান্য করিয়া নানা নৈসর্গিক মুছিবতে ধরা পৃষ্ঠা হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। নূহ নবীর সময়ে তাঁহার কতিপয় সহচর ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় লোক মহাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। অস্বাভাবিক দুষ্কৃতির জন্য লুত্ পায়গম্বরের স্বজাতিরা যে শোচনীয় ভাবে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রাচীন ইতিহাস হইতে এখনও তাহার হৃদয় বিদারক কাহিনী মুছিয়া যায় নাই। দাউদ নবীর সময় ৬০ হাজার বণি ইসরাইল বানরে পরিণত হইয়াছিল, মুছা নবীর আমলে পরষ্পর যুদ্ধ করিয়া এবং বিরাট একদল ফেরাউনের সহিত নীল নদে ডুবিয়া মারা গিয়াছিল। শেষ নবী হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর সময় হইতে নৈসর্গিক শাস্তি বন্ধ হইয়া যায়, কারণ শেষ নবী

আসিয়াছিলেন পৃথিবীর শান্তি দাতা রূপে। আল্লাহতায়ালার ইশারা ছিল—তাঁহার হাবিব্ হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) দ্বারা কেয়ামত পর্য্যন্ত একই ধর্ম্মের জয়-ডঙ্কা নিনাদিত হইতে থাকিবে। ফলে হইয়াছেও তাহাই। আরবের সেই অন্ধকার যুগ ভেদ করিয়া যে স্বর্গীয় আলোক বাহির হইয়াছিল, আজ তাহার বিমল জ্যোতিতে পৃথিবী আলোকিত করিয়াছে।

পৃথিবীর আদম শুমারীর দ্বারা জানা গিয়াছে, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৬০ কোটী মুসলমানের বাস। হজরত রসুলোল্লাহর জীবদ্দশায় মাত্র কয়েক লক্ষ লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া আজ এ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নবী এবং ওলীদের মধ্যে পার্থক্য শুধু নবুয়াতের সীমারেখা টুকু। মানব সমাজের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য যেমন নবীগণ আসিয়াছিলেন, ওলীগণও ঠিক সেই ভাবে আসিয়া থাকেন। তবে নবীগণ আসিয়াছেন —খোদার তরফ হইতে নিয়ন্ত্রিত ধর্ম্ম ও কর্ম্মপন্থা লইয়া, আর ওলীগণ আসেন রসুলে করিম (সঃ) এর আদর্শপথ বাহিয়া। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) মানব সমাজের জন্য যে আদর্শ এবং অনাবিল শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন, ওলীদের দ্বারাই যুগে যুগে তাহাই প্রচার হইতেছে। যাঁহারা প্রকৃত ওলী-আল্লাহ, তাঁহারা মানব সমাজের কল্যাণকর। হজরত শেখ আবতুল কাদের জিলানী (রঃ) ওলীদের মধ্যে সম্রাট্। তাঁহার তুল্য গৌরব অর্জ্জন করা কোনও ওলীর পক্ষে সম্ভব নহে। ইসলামের

সামান্য একটু অবসাদের সময় তিনি আসিয়াছিলেন—সত্যের জুল্‌ফাক্কার হস্তে। তাঁহারই প্রদর্শিত পথই সমস্ত ওলী আল্লাহর গতি ও পরিণতি। তিনি যে অনির্ব্বাণ মশাল জ্বালিয়া গিয়াছেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহা জ্বলিবে।

জড়বাদী পাশ্চাত্যের শিক্ষা অনুসারে বর্ত্তমান যুগের মানুষ নানা ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ সত্য ধর্ম্মের পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। ইহাদের অনেকেই পীরত্বকে ব্যবসাদারী মনে করেন। অথচ আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের মধ্যে যাহাদের খোদার উপর আস্থা বা বিশ্বাস নাই, কোন 'দায়' উপস্থিত হইলে তাহারাও পীর সাহেব, দরবেশ সাহেবের সম্মুখে নতজানু বসিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেও লজ্জিত হয় না। তখন বিজ্ঞান কিংবা দর্শন শাস্ত্রের 'এলেম্' তাহাদের সমস্যা দূর করিতে পারে না। ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, মানুষ যতই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হউক না কেন ওলীদের খোদা প্রদত্ত শক্তির কাছে তাহা অতি ক্ষুদ্র—অতি নগণ্য। তবে একথা সত্য যে, যাঁহারা প্রকৃত পীর বা দরবেশ, তাঁহাদের অন্তর দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ—নিষ্কলুষ, তাঁহারা দুনিয়ার সম্মান প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষী নহেন। খোদার রাহে নিজেদের হাস্তিকে তাঁহারা এমন ভাবে মিটাইয়া দেন যে, তাঁহাদের নিজের কোন ব্যক্তিগত হাস্তি থাকে না।

গওসল্ আজম হজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর মর্য্যাদা এত উন্নত ছিল কিসের প্রভাবে, তাহা সত্যই জ্ঞান ও বুদ্ধির বাহিরে। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) এর

চরিত্র, রীতিনীতি এবং আচার ব্যবহার যেমন অন্য নবীদের সহিত তুলনা যায় না, সেইরূপ গওসল আজমের সহিত অন্য ওলীদের তুলনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নহে। খোদার প্রতি এইরূপ আত্মসমর্পন আর কেহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বাহির ও ভিতর সমভাবে স্বচ্ছ ও আলোকিত ছিল। চরিত্রের কোথাও একবিন্দু মলিনতা কিম্বা দোষক্রটী তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের কোনো মুহূর্ত্তে পরিলক্ষিত হয় নাই। পীর বাকা বিন্ বতু বলিয়াছেন—কথা ও কার্য্যে আচার ও ব্যবহারে এবং রসুলোল্লাহ (সঃ) এর নির্দ্দিষ্ট সুন্নত সমূহের পয়বন্দীতে বড় পীর সাহেবের কোন দিন সামান্য ক্রটী বিচ্যুতি আমাদের নজরে পড়ে নাই। ওলীগণ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের যে সীমা রেখায় পৌঁছিতে পারেন, গওসল আজমের নিকট সে সীমারেখা ছিল অতি নিকটে, তিনি ইহার বহুদূর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শেখ আব্দুর রহমান এবনে আবুল হাসান রাফায়ী বর্ণনা করিয়াছেন—আমি একবার বাগদাদে যাইয়া বড় পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম, কি অদ্ভুত মানুষ ! আমার মামু ছিলেন একজন দেশমান্য প্রবীণ পীর। বাড়ী ফিরিয়া বড় পীর সাহেবের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গেলে তিনি আমাকে বাধা দিয়া কহিলেন—আব্দুর রহমান ! বড় পীর সাহেবের কথা আলোচনার বাহিরে। তাঁহার মাহাত্ম্য এবং স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করিবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধি আমাদের

নাই। সুতরাং আদার বেপারী হইয়া জাহাজের খবর লইতে যাওয়ার সার্থকতা কি আছে?

একদিন পীর আলী কারশী এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে ছিলেন—তুমি শেখ হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) কে যদি দেখিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতে পারি, তুমি এমন এক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ লাভের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছ, যিনি আল্লাহের পথে নিজের হাস্তিকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়াছেন। মানুষ শত চেষ্টা করিলেও তাঁহার স্থানে পৌঁছিতে পারে না। ফেরেশতাগণের স্থান তাঁহার নিম্নে। ওলীদের স্থান তাঁহার পাদমূলে।

ফাতেহায়ে এয়াজ্‌দহম্‌ বা বিশ্ব-মুসলমানের শোক পর্ব্ব

পশ্চিম আকাশের মেঘের কোলে রবিওস্‌ সানির বাঁকা চাঁদ প্রথম উঁকি মারিতে দেখিলে বিশ্ব-মুসলমানের প্রাণে দোলা দিয়া যায়—সুদূর অতীতের এক অসহ্য বিয়োগ স্মৃতি। হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই চাঁদের ১১ই তারিখে মুসলিম জগত হইতে এমন এক পুর্ণিমা-শশী অস্তমিত হইয়াছে, কেয়ামত অবধি যাহা আর উদয় হইবে না। তবে একথা চিরন্তন সত্য যে, এই মহাপুরুষ যবনিকার অন্তরালে মুখ লুকাইলেও বিশ্ববাসীর মনের অন্তরাল হন নাই। কালের এক দীর্ঘতম ব্যবধান রচিত হইলেও এখনও কোটী কোটী নর-নারীর মনে তিনি ভক্তির আসন জুড়িয়া বসিয়াছেন—তাহার পরিচয় পাই আমরা ফাতেহায়ে এয়াজদহম বা গেঁয়ারুয়া শরীফের শোক-তিথির দিনে। কোটী কোটী মুসলমান নর-নারী এই দিন শোক-তিথি উদ্‌যাপন করিয়া এই মহামানবের উদ্দেশ্যে নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে। এই দিন মিলাদ শরীফ্‌ পাঠ, গরীব মিস্‌কিনদিগকে ভূরিভোজন, ফাতেহা ও দোওয়াখানি প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এমনকি ঐ স্মৃতি চির জাগরূক রাখিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক প্রত্যেক চাঁদের ১১ই তারিখেও

এই অনুষ্ঠান করেন। কলিকাতার মুসলমানগণ গেঁয়ারুয়া শরীফের নামে পাগল। ইহাদের মধ্যে যাহারা অতি দিন-মজুর, তাহারাও পর্য্যন্ত নিজেদের কঠোর কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ কিছু কিছু সঞ্চিত করিয়া ঐ দিন পুণ্য ও ধর্ম্মজ্ঞানে ব্যয় করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ফাতেহায়ে এয়াজদহমের দিন সরকারী ছুটীর ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া চাকুরিয়া মুসলমানগণ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিতেন না। গত ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় আইন পরিষদ কর্ত্তৃক ঐ দিন সরকারী ছুটী ঘোষিত হইয়াছে। ফাতেহায়ে এয়াজদহমের দিন মিলাদ পাঠ, দোওয়া খানি, গরীব মিসকিনদিগকে আহার করাইলে খুবই পুণ্যের সঞ্চয় হয়। তবে সিন্নি চড়ান, কাওয়ালী গান, বাতি জ্বালান ইত্যাদি রেছমগুলির মধ্যে গায়ের ইস্‌লামিত্বের প্রভাব বিদ্যমান, সুতরাং ইহার দ্বারা সওয়াব্ অপেক্ষা গোনাহের ছোঁয়াচ লাগার সম্ভাবনাই বেশী। তবে বিশুদ্ধ ও ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রাচীন মহাপুরুষদিগের স্মৃতি যতই বেশী জাগাইয়া রাখা যায়, ততই কল্যানের বিষয়।

—আল-ফাতেহা—